২০

বিশ্বব্যাপী এক খ্রীষ্টধর্ম

১৮০০-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ

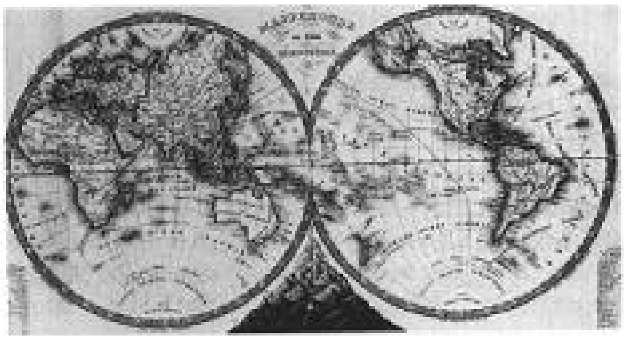

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ধর্মীয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে ঝিমিয়ে পড়া আটলান্টিকের ওপারের বাণীপ্রচার ক্ষেত্রগুলোও পুনরুজ্জীবিত হয়। উক্ত শতাব্দীর আগাগোড়া প্রেরণকার্যের সাহায্য-সহায়তাদানের নিমিত্তে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও দূর-দূরান্তে মঙ্গলবাণী ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নারী-পুরুষদের অসংখ্য ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠার একটা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত প্রেরণকর্মীগণ তাদের সরকারসমূহের সাহায্য-সমর্থন সব সময় না পেলেও অজানা দেশের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছেন।

আলোচ্য শতাব্দীর শেষ দিকে এসে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে নেয় আর বিজিত উপনিবেশগুলোতে তাদের নিজ দেশের প্রেরণকর্মীদের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। মঙ্গলবাণী প্রচার লাভজনক হয় বটে, কিন্তু অভিপ্রায়ের অসংখ্য অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছিল যেগুলো কিনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পোপতন্ত্রকে এক বিপাকের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সেই সময় স্থানীয় মণ্ডলীগুলো গড়ে তোলার ব্যাপারে একটা চিন্তা ও প্রচেষ্টা দেখা দেয় যাদের নিজস্ব যাজক থাকবে, তাদের নিজ সংস্কৃতিজাত ধর্মীয় অভিব্যক্তির নিজস্ব পন্থা-পদ্ধতি থাকবে।

॥১॥ ঊনবিংশ শতাব্দীতে মঙ্গলবাণী প্রচারমূলক পুনরুজ্জীবনের সূচনা

১। নতুন নতুন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা-পরিস্থিতি

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ট্রাফালগারে ইংরেজদের বিজয় ইংল্যাণ্ডকে সাগরের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয় কিন্তু কাথলিক প্রেরণকর্মীদের আটলান্টিকের ওপারে যাওয়ার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় প্রটেস্টান্ট প্রেরণকার্যমুখী সমাজগুলো বিদেশে তাদের প্রচারকার্য শুরু করে। ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দের বিভিন্ন চুক্তি সমুদ্রযাত্রার উপর স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এ সময় স্পেন ও পর্তুগালের অধঃপতন শুরু হয়। তাদের আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলো তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে। সামুদ্রিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, উপনিবেশ ও বাণীপ্রচার কার্যে এ সময় হতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স দু'টি বড় প্রতিযোগী শক্তিতে পরিণত হয়। সবকিছু সহজ ক'রে তোলার লক্ষ্যে বলা হয় যে, ইংল্যাণ্ড ছিল প্রটেস্টান্ট প্রেরণকার্যের রক্ষাকর্তারূপে এবং ফ্রান্স ছিল কাথলিক প্রেরণকার্যের রক্ষাকর্তারূপে।

সমুদ্রযাত্রা ও আবিষ্কার

আলোচ্য শতাব্দী জুড়ে পালের জলযানকে ক্রমান্বয়ে বাষ্পীয় জলযানের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন থেকে ভারতের বোম্বে পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা অর্ধেক হয়ে যায় বলে দূরপ্রাচ্য অনেক কাছে চলে আসে। তথ্য-অনুসন্ধানীগণ বিভিন্ন মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন আগে যেগুলোর শুধুমাত্র উপকূলীয় এলাকা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা ছিল। এঁরা ছিলেন নতুন নতুন অঞ্চল সন্ধানী প্রখ্যাত পণ্ডিত, দুঃসাহসী অভিযাত্রী ও অভিবাসী। লাজারিষ্ট ফাদার হাক ও গাবেৎ রচিত 'তিব্বত ভ্রমণ' (১৮৩৪-১৮৪৬) বইটি ছিল একটি সর্বাধিক বিক্রিত পুস্তক। জাম্বেজি-এর গতিপথ অনুসন্ধানকারী লিভিংস্টোন (১৮১৩-১৮৭৩) ছিলেন একজন ডাক্তার ও যাজক।

প্রেরণক্ষেত্র ও রোমান্টিকতা

ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুরাতন ব্যবস্থার ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়ার মানসে খ্রীষ্টানগণ একদিকে যেমন বিদেশের প্রেরণক্ষেত্রগুলো, অন্যদিকে তাদের নিজ দেশের প্রেরণক্ষেত্রগুলোও (দ্র: ১৭শ অধ্যায়) পুনরাবিষ্কার করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে চাট্যব্রিয়াণ্ড তাঁর 'খ্রীষ্টধর্মের সৃজনী ক্ষমতা' গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় অতীতের মূল্যবোধগুলোর সঙ্গে প্রেরণক্ষেত্র ও [২৪৮]
প্রেরণকর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এটাই ছিল বাণীপ্রচারধর্মী রোমান্টিকতার সূচনা, যা বর্তমান কাল পর্যন্ত অসংখ্য কর্মকাণ্ড ও সংবাদপত্রকে প্রেরণা যুগিয়েছে ঃ প্রেরণকার্যকে একটি বিদেশী নবোদ্যম এবং একই সঙ্গে ফরাসী প্রভাবের একটি উপাদান রূপে গণ্য করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর যেজুইটদের 'উপদেশমূলক এবং অনুসন্ধিৎসু পত্রাবলী' ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনবরত পুনর্মুদ্রিত হয়।

অতীতের ন্যায় খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ 'অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় অবস্থান করছে যারা', তাদের সকলের অনন্ত পরিত্রাণের ব্যাপারে বেশী মনোযোগী ছিলেন। একই মনোভাব প্রেরণকর্মীদেরও প্রবুদ্ধ করে, যারা ফ্রান্সে প্রচারকার্যে ও যারা 'অসভ্য আদিবাসীদের' নিকট মঙ্গলবার্তা ব'য়ে নেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাথলিকরা চাইত প্রচারকার্যে প্রটেস্টান্টদের, আর প্রটেস্টান্টরা চাইত কাথলিকদের ছাড়িয়ে যেতে।

কিছু কিছু মানুষ ইউরোপে যে সকল বাধাগুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেগুলো থেকে মুক্ত নতুন খ্রীষ্টসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী ছিল। একজন প্রেরণকর্মী সেই আদি মণ্ডলীর প্রেরিতশিষ্যদের মত একই অবস্থার সম্মুখীন হন যখন সে প্রথমবার খ্রীষ্টধর্মের কথা শুনছে এমন মানুষদের কাছে মঙ্গলবাণী বইয়ে নিয়ে যান। অবাস্তব আদর্শবাদী সমাজতন্ত্রীরাও সাগরের ওপারে তাদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে আকাঙ্ক্ষী ছিল !

একই সময়ে তাদের সমকালীন অনেকেরই মত খ্রীষ্টানগণও মানুষের বহু শোচনীয় অবস্থার সংশোধনকল্পে উদ্বিগ্ন হন। মঙ্গলবাণী প্রচারের সঙ্গে সব সময়ই মানুষকে উন্নত ও সুসভ্য করা এবং মানবতাবোধ জাগ্রত করার

প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট হয়ে এসেছে। প্রেরণকর্মীগণ ছিলেন শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, সময় সময় পণ্ডিতও বটে। ইউরোপীয় চুক্তি লঙ্ঘন করে আরবীয় বণিকদের দ্বারা দাসত্ব-বন্ধনে বিক্রি হয়ে যাওয়া 'হামের দুঃখী সন্তানদের' (আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের) প্রতি তারা করুণার্দ্র ছিলেন। ইউরোপকেন্দ্রিক এক দৃষ্টিভঙ্গীতে খ্রীষ্টানগণও, ইউরোপীয় মতে, কোন কোন দেশে সভ্যতার ধীরগতিসম্পন্ন অগ্রগতি দেখে অবাক হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা মনে করে পৃথিবী একটা বিশ্বজনীন সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর অবশ্যই খ্রীষ্টধর্ম হবে এই প্রকৃত সভ্যতার ধর্ম।

২। প্রেরণকার্যাবলীর সংগঠন

ঊনবিংশ শতাব্দীর মৌলিকত্ব পরিলক্ষিত হয় প্রেরণকার্যাবলীর সংগঠন, অর্থের সংস্থান, কর্মীর ব্যবস্থাকরণ, বিভিন্ন কাঠামো গড়ে তোলা এবং কিছুটা কম হলেও একটা ধর্মতত্ত্ব প্রণয়নের মধ্যে। প্রেরণকার্যাবলী খ্রীষ্টীয় চেতনায় একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছিল, তাই তো খ্রীষ্টমণ্ডলী মঙ্গলবাণী প্রচারধর্মী নবোদ্যমের বিষয়ে মন দিতে শিক্ষা লাভ করে।

জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণকার্যের মূল

প্রটেস্টান্ট মহলে, বিশেষ ক'রে ব্যাপ্টিষ্টদের মাঝে দৃষ্টান্ত স্থাপন শুরু হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে চর্মকার উইলিয়াম কারি নটিংহামে প্রেরণকার্যের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনিই ব্যাপিষ্ট মিশনারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির জন্ম প্রত্যক্ষ করল। একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বাইবেল সোসাইটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল প্রকাশ করতে শুরু করে। এগুলো মঙ্গলবাণী-প্রচারের একটা ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এ সকল সোসাইটি প্রতি সপ্তাহে একটা চাঁদা দেওয়ার জন্য ধনী-গরীব সবার কাছে আবেদন জানাত। দান বাক্সগুলো প্রকাশ্য স্থানে রেখে দেওয়া হত। ফরাসী বিপ্লবের সময় যে সমস্ত ফরাসী যাজক বিদেশে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফ্রান্সে ফিরে এসে এই দৃষ্টান্তের কথা সকলকে অবহিত করেন।

এই যে প্রটেস্টান্ট প্রতিযোগিতা এটা প্রায়ই খ্রীষ্টীয় দানশীলতার মূল্যে কাথলিকদের কাছে এটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ ছিল। তর্ক-বিতর্ক বৃদ্ধিই পায়। প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায় একে অপরকে বিধর্মীদের ধর্মান্তরিতকরণে অসাধু উদ্দেশ্যে ও অসৎ পদ্ধতি প্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর ফ্রান্সে প্যারিস ফরেন মিশন ছোট আকারে

[২৪৮] প্রেরণকার্যমূলক রোমান্টিকতার জন্ম

'খ্রীষ্টধর্মের সৃজনী ক্ষমতা' নামক পুস্তকটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং তারপরও সময় সময় সমগ্র প্রেরণকার্য সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল।

"প্রতিমা-পূজারীরা কিছুতেই অবহিত নয় সে ঐশ উদ্দীপনা সম্পর্কে, যা মঙ্গলসমাচারের প্রেরিতদূতকে উদ্দীপিত করে থাকে। একাডিমি-এর রাজপথ প্রাচীন দার্শনিকগণও অসভ্য জাতিকে সুসভ্য করা, অজ্ঞদের শিক্ষাদান, পীড়িতদের নিরাময়করণ, গরীবদের বস্ত্রদান এবং শত্রু দেশের মধ্যে ঐক্য ও শান্তির বীজ বপনের এক মহান উদ্দীপনার পথে চলতে এথেন্সের যত আনন্দ কখনও পরিত্যাগ করেননি। খ্রীষ্টধর্ম ঠিক তা-ই করেছে এবং এখনও ক'রে যাচ্ছে। সমুদ্র, ঝড়-ঝঞ্ঝা, মেরু অঞ্চলের বরফ, গ্রীষ্মকালীয় উত্তাপ – কিছুই তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি ঃ তারা সিলের চামড়া দিয়ে তৈরী পোশাক পরিধান করে এস্কিমোদের সঙ্গে বাস করেন, গ্রীণল্যাণ্ডবাসীদের সঙ্গে তিমির তেল খেয়ে জীবন ধারণ করে; তারা তাতারদের বা আইরোকুইদের সঙ্গে নির্জন পতিত ভূমির মাঝ দিয়ে অতিক্রম করেন; তারা আরবদের দ্রুতগামী কুঁজওয়ালা উটের পিঠে আরোহণ করেন বা উত্তপ্ত মরুভূমিতে কাফির-এর অনুগমণ করেন; চীনা, জাপানী ও ভারতীয়রা হয়েছেন তাদের খ্রীষ্টধর্মে নবদীক্ষিত। সমুদ্রস্থিত এমন কোন দ্বীপ বা শৈলশিরা (reef) নেই যা তাদের উদ্যমের নজর এড়িয়ে যেতে পেরেছে। সেকালে আলেকজাণ্ডারের উচ্চাভিলাস মিটানোর জন্য যেমন যথেষ্ট সংখ্যক সাম্রাজ্য ছিল না, ঠিক তেমনি তাদের প্রেমশীলতা প্রদর্শনের জন্যও পৃথিবী পর্যাপ্ত নয়।"

চাট্যুব্রিয়াণ্ড , Le Génie du Christianisme (১৮০২), চতুর্থ ভাগ, ৪র্থ খণ্ড, ১ম অধ্যায়

তার কার্যক্রম শুরু করে। ইহা অর্থ সাহায্যের আবেদন জানায় এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মবিশ্বাস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি সংস্থা চালু করে। লিয়োন্সে পলিন জেরিকো দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ডজন ডজন, শত শত ও হাজারে হাজারে দাতাদের সংগঠিত ক'রে প্রতি সপ্তাহে চাঁদা দানের প্রটেস্টান্ট রীতিকে নিখুঁত ক'রে তোলেন। অধিকন্তু, আমেরিকায় কর্মরত ফরাসী যাজকগণও তাঁদের স্বদেশবাসীদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতেন। বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন তাদের প্রেরণকার্যাবলী প্রচারণার জন্য বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বাস বিস্তারের বর্ষবিবরণ' ছিল এ ধরনের সর্বপ্রথম পত্রিকা। বর্ষবিবরণীতে 'দুই পৃথিবীর ধর্মপাল ও প্রেরণকর্মীদের পত্রাবলী' প্রকাশ করা হত এবং সুনিশ্চিত অনুসারক পত্র আহ্বান করত। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এর মাসিক সার্কুলেশন ছিল ১৫,০০০ আর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এসে দাঁড়ায় ১৭৮,০০০-এ এবং তা কয়েকটি ভাষায় প্রকাশ করা হত। ১৮২৩ ও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এক শতাব্দীতে ৩৮০টি প্রেরণকার্য বিষয়ক পত্রিকা চালু হয়েছিল।

মঙ্গলবাণী প্রচারকর্মী

আলোচ্য শতাব্দীর শুরুতে অন্যান্যদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মপালদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে বহু যাজক ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইউরোপ ত্যাগ করেন। পুরাতন বাণীপ্রচারধর্মী ধর্মসংঘগুলো ক্রমান্বয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়, যেমন – প্যারিস ফরেন মিশন, লাজারিষ্ট, ফাদারস্ অব দ্য হলি স্পিরিট সংঘগুলো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও ছিল নানাবিধ বিষয়ে আগ্রহী ও কুশলী বড় বড় সম্প্রদায়গুলো, যথা – যেজুইট, ফ্রান্সিস্কীয়, ডমিনিকীয় সংঘ। ডটারর্স অব চ্যারিটি-এর ন্যায় তাদের প্রধান কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রেরণকার্যকে সংযুক্ত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অভিনবত্ব ছিল – এমন সব ধর্মব্রতী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা, যেগুলো বিশেষভাবে প্রেরণকার্যে নিবেদিত ছিল ঃ এদের মধ্যে ৫৩টি ছিল পুরুষ ও ২০০টি মহিলা সম্প্রদায়। এই সময় হতেই ধর্মপ্রচার সংসদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী ছিল।

প্রটেস্টান্ট প্রেরণকর্মীদের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, তাঁরা ছিলেন আলোচ্য শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বাণী প্রচার সংঘের অন্তর্গত। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৩০০টিরও অধিক ধর্মসমাজ ছিল; এদের কিছু কিছু সরকার সমর্থিত মণ্ডলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু অনেকগুলোই ছিল স্বায়ত্বশাসিত এবং এদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক, এরপরে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুব কাছাকাছি অবস্থান। এছাড়াও জার্মান, ডাচ ও সুইস ধর্মসমাজও ছিল। ফ্রান্সে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের প্রটেস্টান্ট মিশনস্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যথাসময়ে দেশীয় খ্রীষ্টানগণ পালক পদ লাভ করেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লেসোথো-এ (উত্তর আফ্রিকায়), এবং স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় মণ্ডলী গঠিত হয়।

প্রেরণকার্য পদ্ধতিসমূহ

প্রেরণকর্মীদের প্রধান প্রধান উদ্বেগ ও তাদের ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ আংশিকভাবে তাদের জন্মস্থানের উপর নির্ভর করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রটেস্টান্ট প্রেরণকর্মীগণ সচরাচর শহরের মানুষ ছিলেন। সরাসরি কারিগরদের (কর্মকার, তাঁতী, মিস্ত্রীদের) মধ্য থেকে সংগৃহীত হতেন বলে তাদের মূলতঃ একটা বাইবেল-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ থাকত। পরবর্তীতে তাদেরকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে বেশী করে নেওয়া হয়। জোড়ায় জোড়ায় তারা বেরিয়ে পড়ে কোন প্রেরণগত সংসারে জীবন-দৃষ্টান্তের মূল্যের উপর সবিশেষ জোর দিতেন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আচরণের সঙ্গে তাদের এরূপ আচরণের বৈপরিত্য প্রমাণ করতেন। প্রটেস্টান্ট প্রেরণকর্মীগণ চেয়েছিলেন একটা দেশীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তুলতে।

কাথলিক প্রেরণকর্মীগণ ছিলেন প্রধানতঃ ফ্রান্স, আয়ারল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডের অধিকাংশ খ্রীষ্টান অঞ্চলের মানুষ। তারা যে সকল দেশে বাণী প্রচার করতেন, সেখানকার কৃষিজীবী জনসমাজের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতেন।

প্রেরণকর্মীগণ ইউরোপে তাদের অভ্যস্ত জীবন-ধারা সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। শুরুর পর্যায়ে সম্ভব হলে একটি ছোট গীর্জা তৈরী করতেন প্রটেস্টান্টগণ বাইবেল পাঠের ব্যাপারে বেশী উৎসাহ দান করতেন। কাথলিকেরা উপাসনার উপর বেশী জোর দিতেন এবং উহাকে আড়ম্বরপূর্ণ করার চেষ্টা করতেন যাতে তা হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠে।

প্রেরণকর্মীগণ স্থানীয় ভাষা শেখার ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। অনেক জায়গায় তারা ভাষাতত্ত্ব পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেন। তারা ছিল লিখিত ভাষাভিত্তিক সভ্যতার মানুষ। শিক্ষালয় ছিল ধর্মবিশ্বাস ও সভ্যতা সম্পর্কে

জ্ঞানার্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বিদ্যালয়ের জন্য এই যে গভীর আকর্ষণ, এটা স্থানীয় যত কৃষ্টি ধ্বংসের জন্য দায়ী ছিল। নিঃসন্দেহে শ্রুতিপরম্পরা ও রীতিনীতির প্রতি মনোযোগী হতে প্রেরণকর্মীদের সময় লেগেছিল। সেগুলোকে তারা পৌত্তলিক মনে করে প্রায়শঃ সন্দিহান ছিলেন। এসব কিছুর সঙ্গে মানুষের প্রতি জনহিতকর সেবাদান যুক্ত করেন। ইউরোপ থেকে আনীত দানের আর্থিক সহায়তায়, অভাব পূরণ ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হয়। কাথলিকগণ দাতব্য কার্যে অপেক্ষাকৃত বেশী মনোযোগী ছিলেন। ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রটেস্টান্টগণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুবিধার বিষয়ে বেশী জোর দেন ঃ চাষাবাদকে ঢেলে সাজান ও কাজকে পবিত্রীকরণের একটা উপায়ে পরিণত করেন।

পোপের নির্দেশপত্র

পোপতন্ত্র প্রেরণকার্যের নির্দেশনার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণে খুব দ্রুত আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিল। ধর্ম-প্রচার সংসদকে ঢেলে সাজান হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। কার্ডিনাল বার্তোলমেও কাপেল্লারী ১৮২৬ থেকে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এর প্রধান ছিলেন। এরপরই তিনি ষোড়শ গ্রেগরী নাম ধারণ ক'রে পোপ হন (১৮৩১-১৮৪৬)। কাজেই এরপর থেকে প্রেরণকার্য-নীতিতে একটা দীর্ঘকালীন ধারাবাহিকতা টিকে ছিল। পোপ ষোড়শ গ্রেগরী ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণাঙ্গদের দাসত্বের

[২৪৯] পোপ ষোড়শ গ্রেগরীর প্রেরণকার্য-বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা

পোপ ষোড়শ গ্রেগরীকে আপাতদৃষ্টিতে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীল মনে হলেও প্রেরণকার্যক্ষেত্রে তিনি একজন অগ্রণীরূপে নিজের স্বাক্ষর রেখেছেন। পোপ হওয়ার আগে তিনি প্রেরণকার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশ্বাস বিস্তার সংসদের প্রধান ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লেখা বিশ্বাস বিস্তার সংসদের নির্দেশনা ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর তারিখের Neminem profecto পোপ ষোড়শ গ্রেগরীর প্রেরণকার্য বিষয়ক শেষ ইচ্ছাপত্র বিশেষ। দুঃখের বিষয় স্থানীয় যাজকমণ্ডলী-সংক্রান্ত তাঁর নির্দেশাবলী পালিত হয়নি।

"বস্তুতঃ, কোন প্রেরণকার্যক্ষেত্রে প্রত্যেক ও সকল প্রধানকেই – তাঁদের উপাধি যা-ই হোক না কেন – কাথলিক ধর্মমত সম্প্রসারণ ও সংহতকরণের লক্ষ্যে ধর্মপালগণের সব সময়কার ইচ্ছা অনুসারে ধর্মপাল পদে যত বেশী সংখ্যক প্রার্থী সম্ভব দাঁড় করাতে হবে। তাঁদেরকে ধর্মপালদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং একদিন সত্যিই মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ বিন্যাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অনুরূপভাবে, তাঁদের অন্যতম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যরূপে তাঁদেরকে সম্ভাব্য সবকিছু করতে হবে যাতে দেশীয় খ্রীষ্টভক্তগণ যাজকীয় পদমর্যাদা ও যাজকপদে উন্নীত হতে পারেন ... এটা অত্যন্ত জরুরী এবং সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে যাজকীয় আহ্বানবিশিষ্ট যুবকরা ধর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় মেয়াদ অনুসারে অধ্যয়ন ক'রে সু-প্রশিক্ষিত হবে। ...

এভাবেই পোপ মহোদয়ের দীর্ঘস্থায়ী ইচ্ছা অনুসারে যোগ্য যাজকগণকে পাওয়া মণ্ডলীর দায়িত্ব পালনের জন্য এবং এমনকি ধর্মপাল পদে উন্নীত করার জন্য আমরা দেশীয় বা স্থানীয় যাজকদেরকে শুধু সহকারী যাজক ক'রে রাখার প্রথা

ষোড়শ গ্রেগরী
পল দেলারোচের আঁকা পোর্ট্রেট, (ভারসেইলেস্ মিউজিয়াম)

প্রত্যাখ্যান করছি; এর বিলুপ্তি হওয়া আবশ্যক। ইউরোপীয় হোক আর দেশীয় বা স্থানীয় হোক, মঙ্গলবার্তা প্রচারে নিয়োজিত সকল কর্মী সমান।

বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী মানুষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রেরণকর্মীদের রাজনৈতিক ও জাগতিক বিষয়াদিতে জড়িত হওয়া চলবে না। তাদের কোন দলে যোগদান করা বা জাতির বিভেদের কারণ হওয়া চলবে না।

প্রেরণকর্মীগণ যেন এ সমস্ত জনসমাজের সামাজিক জীবনাচার ঠিকমত বুঝতে সচেষ্ট হন, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। মঙ্গলবার্তা পরিবেশন করতে গিয়ে তারা যেন এ সমস্ত বিশ্বাসীবর্গের শিল্প-সাহিত্যকে উপযুক্ত মূল্য দিতে ব্যর্থ না হন।"

Collectanea S.C. De Propaganda Fidei I, 541-5.

তীব্র নিন্দা করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের *Niminem profecto* নামক নির্দেশ পত্রে কতগুলো অত্যন্ত জোরালো নির্দেশ পেশ করা হয় ঃ বিশেষভাবে পোপ মহোদয় সর্বস্তরে দেশীয় যাজকদের সমন্বয়ে স্থানীয় মণ্ডলী গঠনের আহ্বান জানান। প্রথম ভাটিকান মহাসভা প্রেরণকার্যক্ষেত্র বিষয়ক মূলপাঠ তৈরী করেছিল বটে, কিন্তু তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ হয়নি। এই মূলপাঠে দেশীয় যাজকের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে রোমের দেওয়া নির্দেশাবলী ঊনবিংশ শতাব্দীতে খুব কমই পালিত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে যাজকদের গঠন-প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হয় এবং ইউরোপের প্রেরণকর্মীদের কোন কমতি ছিল না। অধিকন্তু আলোচ্য শতাব্দী যতই এগুতে থাকে, ইউরোপীয়গণ ততই যেন বেশী করে অবশিষ্ট পৃথিবীতে তাদের কারিগর, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠতা বোধ করতে থাকেন। খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণও মনে করতেন কোন কোন জাতির ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের প্রত্যাশিত যাজকপদ প্রার্থী হতে বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছে। [২৪৯]

আলোচ্য শতাব্দীর আগাগোড়া রোম কর্তৃপক্ষ তাদের ধর্ম-এলাকার যেমন – প্রতিনিধি-এলাকা ও প্রৈরিতিক প্রদেশ সংখ্যার বৃদ্ধি ক'রে প্রেরণকার্য-ক্ষেত্রসমূহের উপর প্রশাসনিক নজরদারি-ব্যবস্থা জোরদার করেন।

৩। প্রেরণকার্যক্ষেত্রসমূহ ও উপনিবেশন

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রেরণকর্মী মাত্রেই যুগপৎ খ্রীষ্ট ও তার দেশের জন্য কাজ করতেন – এ কথাটি স্বীকার করতে লজ্জার কিছু নেই। প্রেরণকার্যক্ষেত্রসমূহ ইউরোপ ও বাকী বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তবে এই যে সম্পর্ক, এটা ছিল অনেকটাই অসম, একমুখী ঃ ইউরোপ তার সর্বশক্তি নিয়ে আফ্রিকা ও এশিয়ার দিকে হাত বাড়ায়। তবে প্রেরণকার্যের প্রবল প্রয়াস অনেকবার উপনিবেশনের প্রচেষ্টার আগে শুরু হয়েছে।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পূর্বে প্রেরণকার্যের জাগরণ

প্রেরণকর্মীগণ যখন ১৮১৫ থেকে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়টায় ইউরোপ ত্যাগ করতে শুরু করেন, তখন ইউরোপীয় জনমত দূর দেশে উপনিবেশ স্থাপনের খুব একটা আগ্রহী ছিল না। এ অবস্থায় প্রেরণকর্মীদের সমর্থনের উপায় ছিল কম এবং পর্যটক ও তথ্যানুসন্ধানীর স্তরে তাদের অবস্থান ছিল। সময় সময় প্রটেস্টান্ট ও কাথলিকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা খ্রীষ্টানদের উপর নির্যাতন ইউরোপের বিভিন্ন সরকারকে জড়িয়ে ফেলত এবং এ কাজে ইন্ধন যোগাত বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী (যেমনটা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও ইন্দো-চীনে)।

সাম্রাজ্যবাদের যুগ

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর ইউরোপীয় শক্তিগুলো একে অপরের সঙ্গে নতুন নতুন অঞ্চল জয়ের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় ঃ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন-চুক্তি আফ্রিকাকে বিভিন্ন প্রভাববিশিষ্ট এলাকায় বিভক্ত করে। উক্ত চুক্তির ৬নং অনুচ্ছেদ ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর ছত্রচ্ছায়ায় ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। উপনিবেশন মঙ্গলবাণী প্রচারের এক বিশাল ক্ষেত্র উন্মোচন করে এবং প্রেরণকার্য উপনিবেশনের পথ প্রস্তুত করতে পারে। এ অভিন্ন কাজে, যথা – স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণে ঔপনিবেশিক শক্তি ও প্রেরণকার্য একত্রে যুক্ত হয়। উপনিবেশিকরা চাইত প্রেরণকর্মীগণ যেন তাদেরই নিজ জাতির লোক হয়। কোন এলাকার উপর কর্তৃত্বের হাত বদল হলে নতুন প্রভুর প্রেরণকর্মীগণ এসে পুরাতন প্রেরণকর্মীদের স্থান দখল করত।

তবে প্রেরণকর্মী, প্রশাসক, সৈন্য ও উপনিবেশিকের মধ্যে সব সময় যে নির্ভেজাল ঐকমত্য বিরাজ করত এমন নয়। দখলদার শক্তির প্রতি অনুগত থেকেও প্রেরণকর্মীগণ যে উপনিবেশনের অপব্যবহারের প্রতি কম মনোযোগী ছিলেন, তা কিন্তু নয়। বরং প্রশাসকরা প্রেরণকর্মীদেরকে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবেই ভাবতেন। জনসাধারণের মাঝে তাদের উপস্থিতির দ্বারা ও তাদের ভাষাজ্ঞানের মাধ্যমে তারা মানুষের খুব কাছাকাছি ছিলেন। তারা বেগার খাটানো ও সেই শিল্পায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, যা লোকদের চিরাচরিত সামাজিক কাঠামো গুড়িয়ে দিত। ফ্রান্সের যাজক-বিরোধিতা উপনিবেশগুলোতে চালান না হলেও প্রেরণকর্মীগণ খ্রীষ্টধর্মের মূল্যে ইসলামকে আনুকূল্য প্রদর্শনের অভিযোগে প্রশাসকদের অভিযুক্ত করেন।

॥২ ॥বিভিন্ন মহাদেশের এপার-ওপার

১। বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয়দের প্রবাসী হওয়া

যদি বা ইউরোপীয়দের প্রবাসন বা প্রবাসী হওয়ার ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল আগের শতাব্দীগুলোতেই, এর উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সকল খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীই আটলান্টিকের ওপার আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, সেখানে তারা তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছিল।

কানাডা

ফরাসী কানাডীয়দের মধ্যে উচ্চ জন্মহার ও আইরিশ অভিবাসীদের আগমনের ফলে কানাডীয় কাথলিক সম্প্রদায়ের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে টানাপোড়েন বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮০৬ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুইবেকের ধর্মপাল মন্সিনিয়র প্লেসিস ছিলেন কানাডীয় মণ্ডলী সংগঠনের সূচনা। কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে অটোয়াস্থ লাভাল ইত্যাদি) অনেকগুলো ধর্মপাল শাসিত এলাকা সৃষ্টি করা হয়। ধর্মপল্লীগুলোর তত্ত্বাবধানে কাথলিকদেরকে তাদের নিজস্ব স্কুল পরিচালনা করতে অনুমতি দেওয়া হয়। নিজ দেশে কানাডীয় কাথলিকগণ ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমোদের লক্ষ্যে তাদের প্রেরণকার্যমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সেই দেশের নাগরিকদের যে স্বাধীনতা দিয়েছিল, সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ই তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। ব্যাপ্টিষ্ট ও মেথডিষ্টরা দেশের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায় হয়ে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ছিল সেই দেশ যেখানে স্বপ্নের পর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য অভিমুখী পথিকৃৎদের পথযাত্রায় ধর্মপ্রচারকগণ তাদের সহযাত্রী হতেন আর লোকদেরকে শিবির সভায় জড় করতেন। সেখানে ঘটত নৈতিক চেতনাবাণী, প্রার্থনা, গান, আকস্মিক মন-পরিবর্তন ও কম-বেশী হিস্টিরিয়া সংশ্লিষ্ট অসাধারণ ঘটনাবলী।

স্বাধীনতা লাভের সময় যুক্তরাষ্ট্রে কাথলিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০,০০০ মাত্র। প্রথম ধর্মপাল-শাসিত এলাকা ছিল বাল্টিমোর – সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে । কিছু সংখ্যক ফরাসী প্রথম দিকে কাথলিক মণ্ডলীর সংগঠিতকরণে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন – এদের মধ্যে বাল্টিমোরে সালপিসিয়ানদের, লুইজিয়ানায় কয়েকজন ধর্মপালের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাথলিকবাদ ইউরোপীয় অভিবাসন দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল। সবার আগে আইরিশগণই আমেরিকান মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর অধিকারী হন এবং আজও তারা তা দখল ক'রে আছেন। এরপর শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আসে ইতালীয়রা, জার্মানরা, পোলরা ... আমেরিকান কাথলিকরা ছিলেন মূলতঃ গরীব ও শ্রমিক শ্রেণী, যারা বাস করতেন শহরগুলোতে। তাদের কেউ কেউ জাতীয় মণ্ডলীগুলোর মধ্যে নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। আইরিশরা এর বিরোধিতা করেন ও আমেরিকান জাতির অখণ্ডতার সমর্থন করেন।

বাল্টিমোরের দেশীয় মণ্ডলীর মহাসভাগুলো (যেগুলোর প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে) একটি মণ্ডলী সংগঠিত করে যার মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। প্রটেস্টান্ট সংক্রমণের ভয়ে কাথলিক মণ্ডলী কাথলিক শিক্ষালয়গুলোর একটি সুবিন্যস্ত কাঠামো গড়ে তোলে। ইউরোপীয় ধর্মসংঘগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। স্থানীয় ধর্মসংঘেরও উৎপত্তি হতে থাকে, যেমন – ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথ সেটন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধু যোসেফের প্রেম প্রচারিকা ভগ্নীগণ, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আইজ্যাক হেকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধু পলের ফাদারগণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য শতাব্দীর শুরুতে ইণ্ডিয়ানদেরকে খ্রীষ্টাদর্শে উদ্বুদ্ধ করার কয়েকটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল, যাদেরকে কিনা অনবরত পশ্চিমাঞ্চলের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল ও ক্রমাগত উচ্ছেদ করা হচ্ছিল। বর্ণ-সমস্যার ব্যাপারে কাথলিকদেরও তাদের স্বদেশীদের মতই একই মন-মানসিকতা ছিল। গুটি কয়েক ব্যতিক্রম বাদ দিলে

তারা চিন্তা-চেতনা বা সুসমাচার-প্রচারণার ব্যাপারে খুব সামান্যই প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কৃষ্ণাঙ্গ কাথলিকদের সংখ্যা খুব অল্পই থেকে যায়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর আগে আমেরিকান কাথলিকরা প্রেরণকার্যে কোন আগ্রহ দেখাননি। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার মিশনারী সোসাইটি (মেরিনল ফাদার ও সিষ্টারদের) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বহির্মুখী নানা প্রবণতার মুখে দু'জন ধর্মপাল কাথলিক মণ্ডলীকে আমেরিকান সমাজে সম্পৃক্ত করতে ও ইউরোপের মণ্ডলীগুলোর বিপরীতে এর মৌলিকত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা চালান। বাল্টিমোরের মহাধর্মপাল কার্ডিনাল গিবনস্ (১৮৩৪-১৯২১) 'শ্রমের যোদ্ধারা' নামে শ্রমজীবীদের একটি সংগঠনকে রোমের নিন্দা জ্ঞাপন বন্ধ করেন – সংগঠনটির একটা গুপ্ত সংঘের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল (১৮৭৭)। এই নিন্দাজ্ঞাপন শ্রমজীবী মহলে মণ্ডলীর মূল্য বা মর্যাদার হানি করতে পারত, কেননা এই শ্রমজীবী গোষ্ঠীই ছিল মূলতঃ আমেরিকান কাথলিকবাদের মূল ভিত্তি। সেন্ট পলের ধর্মপাল মন্সিনিয়র আয়ারল্যাণ্ড চাইতেন কাথলিক স্কুলগুলোকে রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থার সঙ্গে সংহত করা হোক। কিন্তু এ ব্যাপারে জনমত তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কাথলিক কর্মকর্তাদের শিকাগোতে ধর্ম-সংসদে অংশ নিতে রাজী করেছিলেন। এভাবে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন আমেরিকার কাথলিক মণ্ডলী উদার নীতিবাদের বিরোধী নয়। কার্ডিনাল গিবনস্-এর সঙ্গে মন্সিনিয়র আয়ারল্যাণ্ড ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ লিও কর্তৃক 'আমেরিকানবাদ'-এর নিন্দাজ্ঞাপনের বিরূপ প্রভাব সীমিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই আখ্যাটির মাধ্যমে চিন্তিত রোমান ঐশতত্ত্ববিদগণ প্রয়োগবাদের প্রতি, প্রাকৃতিক সদ্‌গুণগুলোকে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার প্রতি ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে অবমূল্যায়নের প্রতি লক্ষ্য করেছিলেন। আমেরিকান কাথলিকদের একটা প্রবণতা আখ্যায়িত করেছিলেন। 'আমেরিকানবাদ' কথাটির দ্বারা তাঁদের মণ্ডলীর যে ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পোপ ত্রয়োদশ লিও-এর নিকট দু'জন ধর্মপাল অভিযোগ করেন, কেননা 'আমেরিকানবাদ'-কে একটা নূতন ভ্রান্ত ধর্মমত রূপে দেখা হয়েছিল।

ল্যাটিন আমেরিকা

স্পেন ও পর্তুগালের উপর নেপোলিয়নের আক্রমণ আমেরিকায় স্পেনিশ ও পর্তুগীজদের উপনিবেশগুলোর বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায়। উক্ত উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত অর্জিত হয় ১৮১৭-১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে। স্পেনের শাসকের প্রতি অনুগত-থাকা কিছু সংখ্যক ধর্মপালের দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কারণে সৃষ্ট গভীর বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিপতিত খ্রীষ্টমণ্ডলী কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে পেয়েছিল যখন পোপ ষোড়শ গ্রেগরী নতুন প্রজাতন্ত্রগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বিভিন্ন ক্ষমতাসীন সরকার এমন পুরাতন উপনিবেশিকদেরই মাত্র প্রতিনিধি ছিল যারা ভূমির মালিক হয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রায়শঃ সহিংস পন্থায় উদারপন্থী ও রক্ষণশীলদের ক্ষমতার হাত অদল-বদলের মধ্যে মণ্ডলী সচরাচর রক্ষণশীলদেরই পক্ষাবলম্বন করত, কেননা উদারপন্থীরা যাজক-বিরোধী নীতি অবলম্বন করত। ঊনবিংশ শতাব্দী চলাকালে মণ্ডলীর প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ধস নামে। শাসক শ্রেণীর মধ্যে ফরাসী দার্শনিক ওগ্যস্ত কঁৎ -এর প্রত্যক্ষবাদের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রোমে অনুষ্ঠিত ল্যাটিন আমেরিকার ধর্মপালদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কিছুটা কাথলিক নবায়ন শুরু করে।

এক জটিল ইতিহাস হতে শুধু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মেক্সিকান বিপ্লবটার কথা তুলে ধরি যার ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান প্রণীত হয়। আইন-প্রণেতাগণ দেশীয় অতীতের উচ্চপ্রশংসা ক'রে, উপনিবেশনের চিহ্নগুলো মুছে ফেলতে, মণ্ডলীর প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস করতে চেয়েছিলেন আর এজন্য যাজকদের সংখ্যায় একটা সীমা নির্ধারণ করেছিলেন ও মণ্ডলীর কর্মকর্তাদের স্কুলগুলোর প্রধান হতে বারণ করেছিলেন । এতে কাথলিকরা খ্রীষ্টরাজের নামে বিদ্রোহ করেন; গৃহযুদ্ধ প্রবল আকারে ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্যাতনের প্রাদুর্ভাব শেষ হয়ে যায়নি।

অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম প্রথম দণ্ডপ্রাপ্তদের একটি উপনিবেশ ছিল, কিন্তু পরে তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে অভিবাসী বা প্রবাসীদের একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। প্রবাসীদের মধ্যে আইরিশরা গুরুত্বপূর্ণ একটি কাথলিক সমাজ স্থাপন

করেন তাদের নিজস্ব মাণ্ডলিক প্রশাসন নিয়ে – ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সিডনিতে একজন মহাধর্মপাল ও দু'জন ধর্মপাল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিডনির মহাধর্মপাল কার্ডিনাল মোরান -এর সুদীর্ঘ মণ্ডলী পরিচালনা অষ্ট্রেলীয় কাথলিক মণ্ডলীর পুষ্পিত হওয়ার স্বাক্ষর বহন করে। একটি জাতীয় সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্ণাঙ্গ মহাসভা ও মহাসম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয় এবং কাথলিকরা বিভিন্ন শ্রমিক সংঘ ও ওয়ার্কাস্ পার্টিতে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলটি প্রটেস্টান্ট ও কাথলিকদের একটা দৌড় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। লণ্ডন সোসাইটি অব মিশনস্-এর প্রটেস্টান্টরা তাহিতিতে এসে পৌছেন ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে একুশ বছর বয়সে জন উইলিয়ামস্ সোসাইটি আইল্যাণ্ডস্-এ অবতরণ করেন। তিনি তাঁর দ্য ম্যাসেঞ্জার অব পিস্ নামক নৌযানে ক'রে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যান, সেখানে নির্মাণ করেন ঘর-বাড়ী, গির্জাঘর ও স্কুল। তাছাড়া তিনি তাঁর যাত্রাপথে যাদের সংস্পর্শে আসতেন তাদের রীতি-নীতি সব লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তিনি নিউ হেব্রাইডদের খ্রীষ্টাদর্শে দীক্ষিত করার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন – নরখাদকরা তাঁকে মেরে খেয়ে ফেলে।

কাথলিকরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এসে পৌছেন ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। দু'টি সন্ন্যাসব্রতী সম্প্রদায় এখানকার দ্বীপগুলোকে ভাগাভাগি করে নেয় ঃ Sacré Coeur de Picpus সম্প্রদায় পূর্বাঞ্চল ও লিয়োন্সে-এর মারিষ্ট ফাদারগণ পশ্চিমাঞ্চল। প্রটেস্টান্টদের সঙ্গে কাথলিকদের প্রায়ই ছোটখাটো লড়াই হত যেমনটা ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহিতিতে প্রিচার্ড বিচ্ছিন্ন লড়াইটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। আলোচ্য শতাব্দীতে সকল দ্বীপে দ্রুততার সাথে মঙ্গলবার্তা প্রচারিত হয়। প্রটেস্টান্টরা নিউ ক্যালেডনিয়ায় পদার্পণ করে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে; কাথলিকরা সেখানে তাদের সর্বপ্রথম খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। নিউ গিনিতে খ্রীষ্টীয় অগ্রগতির সূচনা হয় আরও পরে এবং অনেকটা ধীরগতিতে।

বিপুল সংখ্যক প্রেরণকর্মীর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মারিষ্ট সাধু পিয়ের চানেল-এর নাম যিনি ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফিউতুনাতে নিহত হন ; ওয়ালেস-এ ফ্রাঙ্কো পেরেতো (১৭৯৬-১৮৭৩), প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য একটি মহিলা সংঘের প্রতিষ্ঠা এবং একজন পিকপাস ধর্মযাজক ফাঃ দামিয়েন, যিনি মলোকাই (হাওয়াই) দ্বীপের কুষ্ঠরোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং নিজে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলটির বিভিন্ন কৃষ্টির মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়ে উঠেছিল। প্রটেস্টান্ট প্রেরণকর্মী মরিস লীন হার্ট (১৮৭৮-১৯৫৪) একই সময় নিউ ক্যালডনিয়ায় নৃতত্ত্বের উপর একটি বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ লেখা শেষ করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচার সময় সময় 'পণ্যদ্রব্য-বিষয়ক উপাসনারীতি'-এর ন্যায় এক ধরনের সমন্বয় মতবাদ-এর
[২৫০] উৎপত্তি ঘটায়। এটা ছিল বাইবেল পাঠের মাধ্যমে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীগুলোকে এক প্রকারে সচল ক'রে রাখার উপাসনা বিশেষ। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া থেকে কিছু কিছু মেলানেশীয় একটি পরম সুখের স্থান লাভ করার আশা করেছিল, যেখানে থাকবে ইউরোপীয় যত আরাম-আয়াস, কিন্তু তাদের সে আশায় ছিল গুড়ে বালি।

৩। এশিয়া

ভারতবর্ষ

প্রেরণকার্য কর্মকাণ্ডের নবায়নের মানেই ছিল পুরানো সমস্যাগুলোর অভ্যুদয়, যেমন – অধিকারক্ষেত্র নিয়ে বিবাদ ও উপাসনা-রীতি-সংক্রান্ত কলহ। বৃটিশরাজ চলাচল ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিল। বর্ণপ্রথা খ্রীষ্টান গ্রাম তৈরীর মাধ্যমে ঘেরাটোপ গণ্ডীর মধ্যে অবস্থানের এক প্রবণতাকে উৎসাহিত করে ও স্থানীয় যাজকসম্প্রদায় গড়ে তোলার পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। কাথলিক ও প্রটেস্টান্টরা তাদের স্কুলের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা চালায় – এসব স্কুলে সকল ধর্মের লোকদেরই গ্রহণ করা হত। ভারতীয়দের জন্য যেজুইটগণ একটি নব্যালয় খুলেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। সেইসঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে আগত স্থানীয় যাজকদের গঠন-প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে সিংহলের ক্যাণ্ডিতে একটি

সেমিনারী স্থাপন করা হয়।

চীন

আলোচ্য শতাব্দীর শুরুতে চীনা খ্রীষ্টভক্তগণ – যাজক, ভক্তজনগণ ও প্রেরণকর্মীগণ – অনবরত নির্যাতিত হয়েছিলেন। চীনা সরকার বণিক ও প্রেরণকর্মীদের সে দেশে প্রবেশ করতে দিতে রাজি ছিলেন না। কয়েকটি সংঘর্ষের পর পশ্চিমা দেশগুলো ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ও পরের কতগুলো 'অসমান চুক্তি'-এর মাধ্যমে চীনা বন্দরগুলো উন্মুক্ত করতে ও ধর্মীয় [২৫১]
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সম্ভাবনা সৃষ্টিতে সফলকাম হয়।

ফ্রান্স নিজেকে চীনের প্রেরণক্ষেত্রগুলোর রক্ষাকর্তারূপে ভাবে। কাথলিক প্রেরণকর্মীদের ফরাসী পাসপোর্ট ছিল। ভাটিকানের পুণ্য আসনের একান্ত ইচ্ছা ছিল চীনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখার, কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স চীন সরকারের নিকট পোপ ত্রয়োদশ লিও-এর নিকট হতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যাপারে আপত্তি করে।

চীনে খ্রীষ্টান প্রেরণকার্যের আপাতদৃষ্টিতে সাফল্যটা একেবারে ত্রুটিহীন ছিল না। প্রেরণকর্মীগণ ছিলেন ইউরোপীয় বিভিন্ন শক্তির প্রতি অনুগত বিদেশী আর ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে চীনকে শোষণ করত। গুপ্ত সমিতিগুলোর দ্বারা সমর্থিত বিদেশীদের বিরোধী আন্দোলনের বিস্ফোরণ বৃদ্ধি পায়। সবচেয়ে মারাত্মক বিস্ফোরণটি ঘটে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পিকিং-এ ঃ এর স্থায়িত্ব কাল ছিল পঞ্চান্ন দিন। অন্যান্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে ডজন [২৫২]
ডজন প্রেরণকর্মী, বিভিন্ন ধর্মসংঘের সভ্য-সভ্যা ও ধর্মপাল, হাজার হাজার খ্রীষ্টভক্তকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ইউরোপীয় বাহিনী পিকিং শহরকে দখল ক'রে চীনের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করে। তবে সেই

[২৫০] এক ধরনের সমন্বয় ঃ নিউগিনিতে পণ্যদ্রব্য-সংক্রান্ত উপকথা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত পণ্যদ্রব্য-বিষয়ক উপকথা ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। নিম্নোক্ত পাঠাংশে এই উপকথাটিকে ১৯৩০-এর দশকে কিভাবে ব্যক্ত করা হত, তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে।

"আদিতে আন্ত (ঈশ্বর) স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীর বুকে তিনি সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল এবং তারপর আদম ও হবাকে সৃষ্টি করলেন। তিনি পৃথিবীর সব কিছুর উপর তাদের কর্তৃত্ব দান করেন, তাদের বসবাসের জন্য দিলেন একটি স্বর্গোদ্যান। তিনি বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, যথা – টিনজাত মাংস, স্টিলের সাজসরঞ্জাম, ধানের ছালা, তামাকের কৌটা, ম্যাচ সৃষ্টি ক'রে তাদেরকে দিয়ে তাঁর কল্যাণকর সৃষ্টিকর্ম শেষ করেন, কিন্তু তিনি তাদের কোন সূতী বস্ত্র দেননি। কিছু কাল তারা এসব নিয়ে খুশীই ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যৌন সংসর্গের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করল। রাগে-দুঃখে ঈশ্বর তাদেরকে স্বর্গোদ্যান থেকে তাড়িয়ে দেন, বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর শাস্তি দেন। তাদের কাছ থেকে সমস্ত পণ্যদ্রব্য কেড়ে নিতে আদেশ দেন যেন তারা তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবচেয়ে কম সামগ্রী নিয়ে বাকী জীবন অতিবাহিত করে।

ঈশ্বর নোয়াকে একটি বিশাল জাহাজ নির্মাণ পদ্ধতি দেখিয়ে দেন। এই জাহাজটি ছিল একটি বাষ্পচালিত জাহাজ যেমনটা মাডাং বন্দরে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁকে দেন একটি সূক্ষাগ্র টুপি; একটা সাদা শার্ট, হাফ প্যান্ট, জুতা ও মোজা ... মহাপ্লাবন শেষ হলে পর ঈশ্বর নোয়া ও তাঁর পরিবারকে মানব জাতির প্রতি তাঁর নবীকৃত উত্তমতার প্রমাণস্বরূপ পণ্যসামগ্রী দেন ... শেম ও যাফেৎ ঈশ্বর ও নোয়াকে সম্ভ্রম ক'রে চলতে থাকেন। এর ফলশ্রুতিতে তারা পণ্যদ্রব্য পেয়ে উপকৃত হতে থাকেন। তারা শ্বেতাঙ্গ জাতিদের পূর্বপুরুষ হয়ে উঠেন, যারা তাদের সুবুদ্ধির গুণে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু হাম ছিল নির্বোধ। সে তার বাবার নগ্নতা অনাবৃত করে ... ঈশ্বর তার কাছ থেকে পণ্যদ্রব্য কেড়ে নিয়ে তাকে নিউগিনিতে প্রেরণ করেন যেখানে সে হয়ে উঠেছে স্বদেশীয়দের পূর্বপুরুষ।

ঈশ্বর প্রেরণকর্মীদের বলেন ঃ "তোমাদের নিউগিনির ভাইয়েরা ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে। হামের নির্বুদ্ধিতার কারণে তাদের কোন পণ্যদ্রব্য নেই। কিন্তু এখন তাদের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, আমি তাদের সাহায্য করতে চাই। এ কারণেই প্রেরণকর্মীরা, তোমাদের নিউগিনিতে যেতে হবে ও হামের ভুলের প্রতিকার করতে হবে। তার বংশধরদের সৎপথে ফিরিয়ে আনতে হবে তোমাদের। তারা আমাকে পুনরায় সুযোগ দিলে আমি তাদের কাছে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করব, যেমনটা আমি শ্বেতকায় জনসাধারণ, তোমাদের তা পাঠিয়ে থাকি ...।' "

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে একজন লাজারিষ্ট ফাঃ লেব্বে কিছু সংখ্যক প্রেরণকর্মীর জাতীয়তাবোধ লক্ষ ক'রে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে চীনাদের অবমাননা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন।

কাথলিকরা এক বিপুল সংখ্যক মাণ্ডলিক এলাকা ও বিশ্বাসীবর্গের হিসাব দিতে পারলেও প্রটেস্টান্ট ও কাথলিক মিলিয়ে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা ছিল ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশ লক্ষ, যা ছিল মোট চীন জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশ। প্রেরণকর্মীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় এ সময় তারা সনাতন চীনা কৃষ্টির বিষয়ে অনেক কম আগ্রহী ছিলেন। সাংহাই-এ যেজুইটদের পরিচালিত স্কুল ও অরোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষাদান করা হয় – এগুলোতে বিশেষভাবে বিজ্ঞান ও ভাষার উপর জোর দেওয়া হত। চীনা যাজকদের গঠন-প্রশিক্ষণ ল্যাটিনপন্থীই থেকে যায় এবং তাদের পরিবার ও সাংস্কৃতিক মূলধারা থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার প্রবণতাও দেখা যেত।

জাপান ও কোরিয়া

চীনের ন্যায় পাশ্চাত্যের দেশগুলো চাপ সৃষ্টি ক'রে জাপানকে বন্দরগুলো খুলে দিতে বাধ্য করা হয়, কেননা সপ্তদশ

[২৫১] চীনে অসমান পক্ষের চুক্তি ও বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষ

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলো চীনের উপর তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইচ্ছা চাপিয়ে দেয় যাকে 'অসমান পক্ষের চুক্তি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এই চুক্তিগুলোতে অনেকগুলো ধর্মীয় দফা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে চীনাদের মধ্যে বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় যা মাঝে-মধ্যে সহিংসতার উগ্র মূর্তি ধারণ ক'রে আত্মপ্রকাশ করত।

হোয়াম্পোয়ার চুক্তি (১৮৪৪)

"অনুচ্ছেদ-২ ঃ সকল ফরাসী যারা পাঁচটি বন্দরের যে কোনটিতে এসে পৌঁছে, তাদের অবস্থানের মেয়াদ যা-ই হোক না কেন, তারা বাড়ি ও তাদের মালামাল রাখার জন্য গুদাম ভাড়া নিতে পারবে বা জমি প্রস্তুত ক'রে বাড়ী তৈরী করতে পারবে ও সেখানে নিজেরা বাস করতে পারবে। অনুরূপভাবে ফরাসীগণ গির্জা, হাসপাতাল, সেবাসদন, স্কুল ও কবরস্থানও স্থাপন করতে পারবে।"

তিয়েন-সিনের চুক্তি (১৮৫৮)

"অনুচ্ছেদ-৩ ঃ চীনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফরাসী কূটনৈতিক ও (বাণিজ্য) দৌত্য প্রতিনিধিদের সরকারী পত্র যোগাযোগ ফরাসী ভাষায় লিখিত হবে, কিন্তু সম্পর্ক রক্ষার সুবিধার্থে সেগুলোর সঙ্গে যতটা সম্ভব চীনা ভাষায় অনুবাদ থাকবে ... এ ব্যাপারে কোন মতদ্বৈততা দেখা দিলে ফরাসী ভাষার পাঠই অগ্রাধিকার পাবে।

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ খ্রীষ্টধর্মের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষকে সদ্‌গুণে গুণান্বিত করা, তাই খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সকল সভ্য-সভ্যাই তাদের জান-মাল ও স্বাধীন ধর্মানুশীলনের পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করবে; আর দেশের অভ্যন্তরে যে প্রেরণকর্মীগণ শান্তিতে ভ্রমণ করবেন তাদেরকে কার্যকর নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।"

Documents de l'historie 1776-1963 (1964), Vols. 1 & 2

[২৫২] ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে একটি চীনা গুপ্ত সমিতির খ্রীষ্টান-বিরোধী বৈশিষ্ট্য

"অভিশপ্ত হোক এইসব ইউরোপীয়রা, এই মিশনারী কুকুরেরা বা কুকুরদের এই শাসনকর্তারা যারা আসে এক বর্বর ধর্মপ্রচার করতে ও ধর্মীয় প্রজ্ঞাকে ধ্বংস করতে, যারা পুণ্যবান কনফুসিয়াসকে অপবিত্র ও কুৎসা রটনা করে যদিও তাঁর সম্পর্কে লিখিত কোন পুস্তকের একটি পৃষ্ঠাও তারা অধ্যয়ন করেনি। বিধাতা আর ওদের সহ্য করতে পারছেন না, পৃথিবীও ওদের বরদাস্ত করতে নারাজ। তাই এসো, আমরা ওদের আঘাত করি, চিরকালের জন্য ওদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিই। ওদের জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলা হোক কারণ ওরা মিথ্যার বেসাতি ক'রে সাধারণ মানুষকে কুকর্মে প্রবৃত্ত করে, ওদের ভণ্ডামিতে মানুষের অন্তরকে বিষিয়ে তোলার অজস্র পন্থা রয়েছে ... এসো, ওদের দেহকে কুকুরের খাদ্যে পরিণত করতে আমরা তা মরুভূমিতে নিক্ষেপ করি।"

Les Missions Catholiques, ২২শে অক্টোবর, ১৮৭৫ থেকে উদ্ধৃত।

ফাঃ ভিনসেন্ট লেবেব

শতাব্দী থেকে জাপানী বন্দরগুলো ইউরোপের জন্য বন্ধ ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও তারপর ইউরোপীয়রা জাপানী বন্দরগুলোতে প্রবেশাধিকার লাভ করল, তাদের দেশীয়দের জন্য সেখানে গির্জা নির্মাণের অধিকার অর্জন করল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নাগাসাকিতে একজন প্রেরণকর্মী সপ্তদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টানদের [২৫৩]
বংশধরদের আবিষ্কার করেন যারা যাজকদের কোন সাহায্য ছাড়াই তাদের ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। মেইজি যুগের সঙ্গে সঙ্গে জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে নিজের অর্গল খুলে দেয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা মঞ্জুর করা হয়। বিশেষ ক'রে বিভিন্ন স্কুল স্থাপন ক'রে বিপুল সংখ্যক প্রেরণকর্মী ও ব্রতসংঘের সভ্য-সভ্যাগণ জাপানে বসতি স্থাপন করেন, কারণ জাপানীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ লিও ধর্মপাল-শাসিত একটি মাণ্ডলিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এতে সপ্তদশ শতাব্দীর সেই

[২৫৩] ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নাগাসাকিতে প্রাচীন জাপানী খ্রীষ্টানদের সন্ধান লাভ

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে জাপানে খ্রীষ্টানগণ গোপনে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে বাস ক'রে আসছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নাগাসাকিতে একটি ছোট গীর্জাঘর স্থাপনের ঘটনাটি উক্ত খ্রীষ্টানদেরকে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করতে সুযোগ ক'রে দেয়। এসব খ্রীষ্টবিশ্বাসীর কাথলিকতার মানদণ্ড ছিল কুমারী মারীয়া, পোপ মহোদয় ও যাজকদের কৌমার্য। এম. পেটিজ্যাঁ নামে একজন প্রেরণকর্মী নীচের কাহিনীর বর্ণনা দেন ঃ

"১৭ই মার্চের শুক্রবার দিন দুপুর ১২:৩০ মিনিটের দিকে প্রায় পনেরজন লোক গির্জার দরজায় দাঁড়িয়েছিল। ... তিনজন মহিলা তাদের সামনে হাত জোড় ক'রে ও নীচু গলায় আমাকে বলল ঃ 'আমাদের অন্তঃকরণ, এখানে উপস্থিত আমাদের সকলের অন্তঃকরণ আপনার অন্তঃকরণ থেকে কোন পার্থক্য নেই।'

একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'পবিত্রা মারীয়ার প্রতিকৃতি কোথায় ?' শিশু যীশুসহ কুমারী মারীয়ার মূর্তিটা চোখে পড়লে তাদের বড়দিনের কথা মনে পড়ে গেল। তারা আমাকে জানাল একাদশ মাসে তারা বড়দিন পালন করেছে।

অতি অল্প সংখ্যক মানুষই মাত্র দীক্ষাস্নানের কথা জানে। তারা রবিবার ও পার্বণ-দিনগুলো পবিত্রভাবে পালন করে। এখন তারা প্রায়শ্চিত্তকালীন উপবাস করেছে।

দীক্ষাদাতা পিটার আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি দিলেন। সর্বাগ্রে আমি বলব তার দীক্ষাস্নানের মন্ত্রটা সঠিক বলেই মনে হল। ... সে আমাকে রোজারিমালা প্রার্থনার কথাও বলে – খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা আমাদের মতই আবৃত্তি করতে অভ্যস্ত। ... সবশেষে সে আমাকে রোম রাজ্যের সেই মহান নেতার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। যখন আমরা তাকে বললাম তিনি ও তার খ্রীষ্টান স্বদেশীয়রা এইমাত্র আমাদের যে সান্ত্বনাদায়ী সংবাদ দিচ্ছেন, তা জেনে যীশু খ্রীষ্টের সুমহান প্রতিনিধি পুণ্যবান পোপ একাদশ পিউস অতিশয় আনন্দিত হবেন, তখন পিটার মহানন্দে ফেটে পড়ল। তা সত্ত্বেও আমাদের ছেড়ে যাওয়ার আগে সে এই মর্মে আরও আশ্বস্ত হতে চায় যে, আমরা সত্যিই তাদের পুরাতন প্রেরণকর্মীদের উত্তরাধিকারী কিনা।

'আপনাদের কি কোন সন্তান-সন্ততি নেই ?' সে আমাদের ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'তোমরা ও তোমাদের খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা এবং জাপানের বিধর্মী ভাইয়েরাই আমাদের সন্তান-সন্ততি যাদেরকে সদাশয় ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন। তোমাদের সেই প্রথম প্রেরণকর্মীদের ন্যায় পুরোহিতকে সারা জীবন কৌমার্য ব্রত মেনে চলতে হয়।'

এ কথা শুনে পিটার ও তার সঙ্গীরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠে, 'তারা তাহলে কুমার, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

প্রায় সকল খ্রীষ্টানেরই একটা অভিন্ন সংগঠন ছিল। অধিকাংশ গ্রামেই দু'জন প্রধান নেতা ছিল ঃ প্রথম জনকে বলা হত প্রার্থনা-পরিচালক ও দ্বিতীয় জনকে দীক্ষাদাতা ... ।"

ফা: এফ. মার্নাস-এর La Religion de Jesus resuscitée au Japan I,1896 থেকে উদ্ধৃত।

অলৌকিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাপানীরা বিজ্ঞান ও ইউরোপের কলা-কৌশল সম্পর্কে আগ্রহী ছিল, কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের ব্যাপারে তেমনটা নয়। পক্ষান্তরে, জাতীয়তাবাদ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ক্রমবিকাশ [চীনের উপর, রাশিয়ার উপর (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে) ও কোরিয়ার উপর বিজয়] পাশ্চাত্য ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ খ্রীষ্টানদেরকে সন্দেহভাজন ক'রে তোলে।

কোরিয়ায় বরাবরই খ্রীষ্টধর্মকে বিধিবহির্ভূত করা হয়েছে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে একজন প্রৈরিতিক প্রতিনিধিকে নিয়োগ করা হয়। মাঝে মাঝে থেমে থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত নির্যাতন চলা সত্ত্বেও খ্রীষ্টানদের সংখ্যা কিন্তু ঠিকই বৃদ্ধি পায়।

ইন্দোচীন

মন্সিনিয়র পিগ্‌নু্য দ্য বেহাইন (মৃত্যু ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা গিয়ালংকে তার সিংহাসন পুনরায় ফিরে পেতে সাহায্য করতে যে সহায়তা এনে দিয়েছিলেন, তা কয়েক বছর খ্রীষ্টানদের শান্তিতে থাকার সুযোগ ক'রে দিয়েছিল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় নির্যাতন শুরু হয় আর তা অর্ধ শতাব্দী ধরে চলে। তা সত্ত্বেও মঙ্গলবাণী প্রচার কর্মকাণ্ড থেমে থাকেনি। তু-ডাক -এর রাজত্বকালে (১৮৪৭-১৮৮২) অনেকেই ধর্মশহীদের মৃত্যু বরণ করেন। আর তাই একজন ফরাসী ধর্মপাল তৃতীয় নেপোলিয়নকে অনুরোধ করেন যেন তিনি খ্রীষ্টান ও প্রেরণকর্মীদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। একজন স্পেনিশ ধর্মপাল টনকিন-এ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে পর ফ্রান্স ও স্পেনের একটি যৌথ সামরিক অভিযান ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সায়গন দখল ক'রে নেয়। তু-ডাক ফ্রান্সের কাছে ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চল, কোচিন-চীনের অধিকার ছেড়ে দেন। প্রেরণকর্মীদের রক্ষার সূত্র ধরে উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয় এবং মণ্ডলী অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতনাম পুরোপুরি ফরাসী শাসনাধীনে চলে আসে এবং কম্বোডিয়া ও লাওস মিলে ফরাসী ইন্দো-চীন গঠিত হয়। ভিয়েতনাম ছিল দূরপ্রাচ্যের একটি অন্যতম বিরল দেশ যেখানে খ্রীষ্টানরা মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশে পরিণত হয়েছিল (প্রায় দশ শতাংশ)। বেশ আগে থেকে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ পদে ভিয়েতনামী যাজকগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভিয়েতনামে মণ্ডলীর শক্তিকেন্দ্র স্বরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ছিল "ঈশ্বরের গৃহ"। সমাজের সেবায় যারা আত্মনিয়োগ করত – সেমিনারীয়ান, কাটেখিষ্টগণ – তাদের সকলকে এক ধরনের বৃহৎ পরিবার রূপে একত্রে দলবদ্ধ করা হত, যেখানে সবকিছু ছিল সবার। বিভিন্ন নির্যাতনের সময় কাটেখিষ্টগণই মূলতঃ খ্রীষ্টীয় সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখতেন। তবে খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচারে পূর্বপুরুষদের পূজার্চনা বরাবরই একটা বাধাস্বরূপ থেকে যায়।

অর্থডক্সদের প্রেরণকার্য

[২৫৪] সাইবেরিয়ায় সু-পরিকল্পিতভাবে উপনিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে রুশ এশিয়ার খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচার এগিয়ে চলে। রুশরা যে সকল জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসত তাদের কথিত বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র বাইবেল ও উপাসনা অনুবাদের বাইজান্টাইন ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল। মঙ্গলবাণী প্রচারকার্যে এটা বড়ই সাহায্য করেছিল। আর্কিম্যানড্রাইট মাকারি নামে একজন ইহুদী ধর্মান্তরিত ব্যক্তি রুশ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন, আল্টাই অঞ্চলে একটি প্রেরণকার্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এরপর সেই অঞ্চলের উপভাষায় পবিত্র শাস্ত্র ও উপাসনা অনুবাদ করেছিলেন। ১৮২৪-১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথমে একজন যাজক ও পরে একজন ধর্মপালরূপে জন ভিনিয়ামিনব ছিলেন পশ্চিম সাইবেরিয়ার প্রেরণকার্যক্ষেত্রের সাইবেরিয়ার ইয়াকুৎদের কাছে ও আলাস্কার এস্কিমো ও ইণ্ডিয়ানদের কাছে নেপথ্য চালিকাশক্তি। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে মস্কোর মেট্রোপলিটন করা হলে পর তিনি "অর্থডক্স মিশনারী সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন, যা রুশ মঙ্গলবাণী-প্রচারকার্য কেন্দ্রীভূত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে একজন অ-যাজকীয় ভাষাবিদ্‌ নিকোলাস ইলমিনস্কি-এর সহায়তায় কাজান একাডেমীটি প্রেরণকার্য বিষয়ক অধ্যয়নের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইলমিন্‌স্কি ও তাঁর দল বাইবেলের অনেক অনুবাদ করেন ও প্রায় কুড়িটি সাইবেরীয় ভাষায় একটি সত্যিকার অর্থডক্স লাইব্রেরী প্রস্তুত করেন। একটা স্থানীয় যাজকসমাজ গড়ে উঠেছিল। রুশ মণ্ডলী বিদেশেও মঙ্গলবাণী প্রচারে লিপ্ত হয়েছিল – জাপানে প্রেরণকার্যক্ষেত্রটি ছিল প্রসঙ্গতঃ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ফাদার আইভান কাসাৎকিন – একজন সন্ন্যাসী হবার পর যিনি নিকোলাই নাম ধারণ করেছিলেন – ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পরই জাপানী ভাষায়

বাইবেলের নতুন নিয়ম ও উপাসনিক পুস্তকগুলো অনুবাদ করেন। সর্বপ্রথম দু'জন অর্থডক্স জাপানী যাজক অভিষিক্ত হন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। নিকোলাই টোকিও-এর ধর্মপাল হন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং একটা অর্থডক্স কাথেড্রাল নির্মিত হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

৪। আফ্রিকা

অনুসন্ধানীদের যুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আফ্রিকা তখনও দাস-ব্যবসার দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। বিভিন্ন ইউরোপীয় সরকার দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ করেছিল বটে, কিন্তু তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি যতদিন না তা আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশ ও অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। আরব বণিকদের দ্বারা পূর্ব আফ্রিকায় দাস-ব্যবসা অব্যাহত থাকে। প্রেরণকার্য বিষয়ক উদ্বেগ দ্রুত পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস প্রটেস্টান্ট মিশনারী সোসাইটি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ লেসোথোতে কয়েকজন প্রেরণকর্মী প্রেরণ করে। ক্লুনির সাধু যোসেফের সিষ্টারগণ – এ্যান জেভোয়ে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত – ১৮১৯

[২৫৪] সাইবেরিয়ায় অর্থডক্স প্রেরণকার্যক্ষেত্র

আর্কিম্যান্ড্রাইট সিরিডন ১৮৯৬ ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়টাতে বৈকাল লেকের ওপারে কিছু লোককে খ্রীষ্টাদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কিয়েভের এক পত্রিকায় তাঁর প্রেরণকার্য বিষয়ক স্মৃতি প্রকাশ করেছিলেন।

"আমার জীবনের শুরুতেই একজন প্রেরণকর্মীরূপে আমি সবচেয়ে বেশী চাইতাম যতবেশী সংখ্যক লোককে সম্ভব দীক্ষাস্নাত করতে, আর খুবই বিরক্ত হতাম যদি কোন গ্রামে দীক্ষাস্নাত করার মত কেউ না থাকত। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ওটা ঘটেছিল এভাবে।

একদিন আমি একজন মঙ্গোলীয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে তার কুড়েঘরে ঘুমাব ব'লে তার বাড়ী গেলাম। লক্ষ্য করলাম কয়েকটি মূর্তির মধ্যে কোলে শিশু যীশুসহ কুমারী মারীয়ার একটি প্রতিচ্ছবি ঝুলছে। 'তুমি কি দীক্ষাস্নান পেয়েছ?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। 'হ্যাঁ', সে উত্তর দিল। 'তোমার নাম কি?' আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম। মঙ্গোলীয়টি উত্তরে বলল, 'জন'। 'তাহলে তোমার ঘরে কেন এসব মূর্তি? তোমার তো উচিত শুধুমাত্র খ্রীষ্টান প্রতিচ্ছবি, একমাত্র সত্য ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করা।'

'ফাদার, আমি তো তা-ই করতাম, আর আমি তো একমাত্র আপনার রুশ দেবতার কাছেই প্রার্থনা করতাম। কিন্তু তারপরও আমার স্ত্রী, এরপর আমার ছেলে মারা গেল। অনেকগুলো ঘোড়াও হারালাম। আমাকে বলা হল আমাদের আগেকার মোঙ্গলীয় দেবতা আমার উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন, আর তাই তিনি আমার স্ত্রী ও পুত্রের জীবন কেড়ে নিয়েছেন, আমার ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই এখন আমি তার কাছে ও আপনাদের রুশ দেবতার কাছেও প্রার্থনা ক'রে থাকি। জানেন ফাদার, আপনাদের দেবতার বিনিময়ে আমার দেবতাকে পরিবর্তন করার, এক নতুন দেবতাকে গ্রহণ করা এখন আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাময় ও দুঃখের মনে হচ্ছে।'

সে এভাবে বলতে বলতে কাঁদতে আরম্ভ করল। তার জন্য ও তার মত অন্য সবার জন্য আমার খুব দুঃখ হল, মনে খুব কষ্ট লাগল। তখন হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম কারও আত্মা চুরি করে নেওয়ার মানে কি, তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হরণ করার অর্থ কি – তার পরম পবিত্র জিনিস, তার স্বাভাবিক জীবন-দর্শন ও ধর্ম তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিনিময়ে তাকে আর কিছু না দিয়ে, কিন্তু তাকে একটা নতুন নাম ও বুকে একটা ক্রুশ ছাড়া। আমি যে মোঙ্গলীয়ের সঙ্গে কথা বলি তাকে আমার কাছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা ও অসুখী, তার পুরানো ধর্ম হতে বঞ্চিত ও নিয়তির হাতের পুতুল বলেই মনে হল। সেই থেকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আমি আর কখনও দেশীয় লোকদের দীক্ষাস্নাত করব না, বরং তাদের কাছে শুধুই খ্রীষ্টকে ও মঙ্গলবার্তা প্রচার করব।

আর্কিম্যান্ড্রাইট স্পিরিডন, Mes Missions en Sibérie, 1950 থেকে সংগৃহীত।

খ্রীষ্টাব্দে সেনেগালে বসতি স্থাপন করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয়দের ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে লিবারম্যান মারীয়ার পবিত্র হৃদয়ের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, যা অচিরেই পবিত্র আত্মার সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যায়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মন্সিনিয়র দ্য মাজেনড-এর মারীয়ার অবলেটগণ দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে।

"দুই গিনি"-এর প্রৈরিতিক প্রতিনিধি-শাসিত একটি এলাকা সৃষ্টি করা হয় ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রথম খ্রীষ্টাদর্শ প্রচারযাত্রা শুরু হয় ইউরোপীয় বাণিজ্য ঘাঁটিগুলো থেকে। প্রেরণকর্মীদেরকে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি ক'রে আফ্রিকার অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে হয়। তবে আফ্রিকা প্রেরণকর্মীদের কবরস্থান ব'লে প্রমাণিত হয়। এঁদের অনেকেই তাঁদের আগমনের কয়েক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন অসুস্থতায়, যেমন – এক ধরনের সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

কার্ডিনাল লেভিজেরির ব্যক্তিত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব লেভিজেরী ফরাসী মণ্ডলীর ইতিহাসে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আলজিয়ার্সের মহাধর্মপাল নিযুক্ত হলে আফ্রিকাকে খ্রীষ্টাদর্শে দীক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আফ্রিকান প্রেরণকর্মী, হোয়াইট ফাদারদের, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষিজীবী ব্রাদার ও কৃষিজীবী সিস্টারদের (যারা হোয়াইট সিস্টার হয়েছিলেন) এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক ধরনের নাইট টেম্পলার "সাহারার সশস্ত্র ব্রাদার"-দের প্রেরণকর্মীদের রক্ষী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। লেভিজেরি ভেবেছিলেন প্রেরণকার্য শুরু হবে আলজেরিয়ায়, যে দেশটি সাধু আগষ্টিনের খ্রীষ্টধর্মকে পুনরাবিষ্কার করছিল। কিন্তু তিনি ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, কেননা সরকার মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করতে চাইতেন না। লেভিগেরি ব্রাদার ও সিস্টারদের দ্বারা অনাথ যুবক-যুবতীদের বিয়ে দিয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত খ্রীষ্টান গ্রাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কার্থেজের মহাধর্মপাল হলে পর তাঁর কর্মকাণ্ড এমন কি উত্তর আফ্রিকায়ও সম্প্রসারিত হয়।

[২৫৫] ভাটিকানের পুণ্য আসনের নিকট থেকে লেভিজেরি সাহারা ও সুদানের প্রৈরিতিক প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছিলেন। এ কারণে তিনি মঙ্গলবাণী প্রচারের একটি সার্বিক কার্যক্রম প্রণয়ন করেন। প্রেরণকর্মীদেরকে বাহ্যিক প্রথা, যথা – পোশাক-পরিচ্ছদ, বসতবাটি, খাবার-দাবার ও ভাষা ইত্যাদির সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। কিন্তু আফ্রিকা প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলীর অংশ হতে যাচ্ছিল শুধু আফ্রিকানদের মাধ্যমে। একটি অব্যাহত পালকীয় কার্যব্যবস্থার ভিত্তি ছিল এক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত নবদীক্ষার্থীকাল।

সাহারা মরুভূমি অতিক্রমকালে বহুবারই হোয়াইট ফাদারদের জবাই করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা গ্রেট লেক অঞ্চলে স্থায়ী বসতি গড়তে সক্ষম হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উগাণ্ডার যুবক খ্রীষ্টানুসারীগণ তাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্য সাক্ষ্যমর হন। তা ছাড়া, লেভিজেরি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযানে, যার কথা প্রচার করার জন্য তিনি ইউরোপ সফর করেছিলেন।

আফ্রিকার বিভাজন

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেস আফ্রিকায় অবস্থিত ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম, পর্তুগাল ও জার্মানী প্রভৃতির ইউরোপীয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো চিহ্নিত করে দেয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার বিভাজন সম্পূর্ণ হয়। এরপর ইউরোপীয়রা তাদের প্রশাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। তারা দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে, এর পরিবর্তে তারা বেগার খাটা ও বহন-ব্যয় প্রথার প্রচলন করে। উপনিবেশগুলোর প্রত্যেকটিতেই মঙ্গলবাণী প্রচারকার্য সুসংগঠিত করা হয়। এটাই ছিল আফ্রিকান মণ্ডলীর জন্য এক নব সূচনা। শিক্ষাদান ও স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপারে প্রেরণকর্মীগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আফ্রিকায় এগুলোর অবকাঠামোর যোগান তারাই দিয়েছিলেন।

এক বিকল্প উপস্থিতি ঃ চার্লস দ্য ফুকো

সৈনিক ও অনুসন্ধানকারীর এক বিচিত্র জীবন যাপনের পর চার্লস্ দ্য ফুকো (১৮৫৮-১৯১৬) একজন ধ্যানমার্গী হতে মনস্থির করেন। সাহারায় অবস্থিত তাঁর বিভিন্ন আশ্রম থেকে (বেনী-আব্বেস ও তামানরাসে) তিনি মুখের কথায়

নয়, বরং পরম পবিত্র সংস্কারের উপস্থিতি দ্বারা, পবিত্র মীসাবলি উৎসর্গ দ্বারা, প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্ত, পুণ্যগুণের অনুশীলন দ্বারা – ভ্রাতৃসুলভ ও সার্বজনীন উভয় ধরনের ভালবাসার দ্বারা, সকল গরীব, সর্ব সৃষ্টজীব, অজানা-অচেনা সকলের সঙ্গে খাদ্যবস্তুর সর্বশেষ উচ্ছিষ্টটুকু সহভাগিতা ক'রে এবং সকল মানুষকে প্রিয় ভাই-বোনের মত বিশ্বাস করার

[২৫৫] বিষুবরেখা সংলগ্ন আফ্রিকার হোয়াইট ফাদারদের নিকট কার্ডিনাল লেভিজেরির নির্দেশ

মঙ্গলবাণী প্রচার করতে গিয়ে সময় সময় প্রেরণকর্মীগণ বি-সংস্কৃত্যায়ন বা আপন সংস্কৃতি থেকে দেশীয়দের বিচ্ছিন্নকরণ করেছেন । যারা তা করেছেন, তারা সব সময় সচেতন ছিলেন না তারা কি করছেন। এটা যেমন সত্য, অন্যদিকে এটাও বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, প্রায়ই প্রেরণকর্মীরা লোকদের কাছে মঙ্গলবাণী প্রচার করলেও তাদেরকে ইউরোপীয় ক'রে তুলতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

কার্ডিনাল লেভিগরি বনাট-এর অনুকরণে (1888,Musée d´ art moderne, Paris)

"বিষুবরেখা সংলগ্ন আফ্রিকার উদ্দেশে যখন কোন যাজক স্বেচ্ছায় যাত্রা শুরু করেন, তখন থেকেই তাকে আগেই প্রেরণকার্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মন্দগুলো সব হাসিমুখে সহ্য করার জন্য এবং তার সমস্ত চিঠিপত্রকে প্রবক্তা জেরেমিয়ার বিলাপের সম্পূরক না করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

আফ্রিকাকে রূপান্তরে সফলতার প্রথম শর্ত হচ্ছে আমরা যে আফ্রিকানদের বেছে নিই তাদেরকে এমন অবস্থা-পরিস্থিতির মধ্যে গঠন-প্রশিক্ষণ দেওয়া, যা প্রাসঙ্গিকভাবেই তাদেরকে সত্যিকার আফ্রিকানরূপেই থাকতে দেয়। এ যাবৎ তা সাধারণভাবে করা হয়নি এবং আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, আলজেরিয়ায় আমরা একই ভুল করেছি। এ কারণেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে আমি বাধ্য হয়েছি।

কৃষ্ণকায় তরুণদের – এমনকি তাদেরও, যাদেরকে শিক্ষক ও কাটেকিষ্ট করতে চাওয়া হয় – এমন অবস্থার মধ্যে থাকতে দিতে হবে যা তাদেরকে আফ্রিকার উপযোগী জীবন যাপনের সুযোগ দিবে, আর সম্ভব হলে এমন অবস্থার সুযোগ ক'রে দিতে হবে যা তাদের দেবে প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ এবং নির্দ্বিধায় সকলের দ্বারা তারা সমাদৃত হবে। এটা করা এজন্যেই প্রয়োজন যাতে তারা প্রেরণকর্মীদের দিতে পারে জোরালো সহায়তা... তাদের উপর নির্ভর না করে।

আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ তরুণদের বাস্তব শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে আমি বলেছি, তা হতে হবে যথার্থই আফ্রিকান শিক্ষা। পক্ষান্তরে, তাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে হতে হবে মূলতঃ প্রৈরিতিক। আমাদের সাদৃশ্যে দু'ভাবে মানুষকে গঠন করা যায়। প্রথমতঃ বাহ্যিকভাবে তাদেরকে আমাদের মত করে তোলা। সেটা হচ্ছে মানবীয় পন্থা, লোকহিতৈষী সুসভ্যকারীদের পন্থা, তাদেরই পন্থা যারা বলে থাকে (যেমনটা ব্রাসেল সম্মেলনে বলা হয়েছে) আফ্রিকাবাসীদের পরিবর্তন করতে হলে তাদেরকে ইউরোপে চারুকলা ও কারুকলা শিখানোই যথেষ্ট। এসব মানে এই বিশ্বাস করা যে, তাদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেই নাকি তারা তাদের স্বভাব পাল্টাবে। কিন্তু এতে তারা শুধুই তাদের খোলসটা পরিবর্তন করে। তাদের অন্তঃকরণ আগের মতই এবং সম্ভবতঃ তা আরও বেশীই অসংস্কৃত থেকে যাবে, কেননা তাদের অন্তঃকরণও কলুষিত হবে এবং আমাদের বিলাসিতা ও আমাদের উপভোগ সম্পর্কে যা জেনেছে, তা উক্ত কলুষতার সেবায় লাগবে।

ঐশ পন্থাটি বেশ ভিন্ন। সাধু পল এই বলে এ পন্থার কথা ব্যাখ্যা করেন ঃ 'সকলের কাছে আমি সব-কিছুই হয়েছি, যাতে, যেমন ক'রেই হোক, সকলকেই যীশু খ্রীষ্টের নিকট নিয়ে আসতে পারি' (১করিন্থীয় ৯:২২)। প্রৈরিতিক কার্য আত্মার কাজে লিপ্ত হয়, ইহা আত্মাকেই পরিবর্তন করে এটা জেনেই যে, অন্য সব কিছু বাড়তি পাওনারূপে লাভ হবে ... ইহা নিজেকে বর্বরদের কাছে বর্বর, গ্রীকদের কাছে গ্রীক ক'রে তোলে। এমনটাই তো প্রেরিতদূত পল করেছিলেন, আর এটা আমাদের চোখে না পড়ে পারে না যে, এদের যে কেউ প্রথমে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বাহ্যিক পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন। তারা মানুষের অন্তঃকরণ পরিবর্তনে সচেষ্ট ছিলেন। আর তাদের অন্তঃকরণ পরিবর্তিত হলে পর গোটা জগতটাই তারা নবায়িত করেন।"

কার্ডিনাল লেভিজেরি, Ecrits d' Afrique

মাধ্যমে তিনি খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার করেছেন। সর্বসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োজিত একজন ভাইয়ের এই যে বিচক্ষণ উপস্থিতি, এটা সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারের পথ প্রস্তুত করেছে যখন ভবিষ্যতে তা সম্ভব হওয়া উচিত ।

মাদাগাস্কার

ইংরেজ প্রেরণকর্মীগণ মারিসাস দ্বীপ থেকে এসে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মাদাগাস্কারে বসতি স্থাপন করেন। রাজা প্রথম রাডামা কর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হয়ে তারা নিয়ে আসেন বাইবেল, তারপর লিপিবদ্ধ ও সরল বর্ণমালা। তাদের স্কুলগুলো বিপুল সাফল্য লাভ করে। লেখালেখি কিছুটা শক্তি সঞ্চার করল এবং খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচার রাজ্যের সামাজিক কাঠামোগুলোর সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলল। তা ছাড়া রাণী প্রথম রানাভালোনা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে খ্রীষ্টধর্মকে প্রবল আক্রমণ ক'রে স্থানীয় ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত হন। নির্যাতন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বৃটিশ প্রেরণকর্মীদেরকে এই দ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। মুদ্রিত কোন বইপুস্তক রাখা নিষিদ্ধ করা হয়, আর লেখার
[২৫৬] কাজ রাজদরবারের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৫০ জন খ্রীষ্টবিশ্বাসী সাক্ষ্যমর হন। বিদেশী প্রেরণকর্মী না থাকলেও খ্রীষ্টধর্ম টিকে থাকে ও এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের নিকট তা পৌঁছতে থাকে। বাইবেল পাঠ চলতে থাকে লুকিয়ে লুকিয়ে, গোপনে ধর্মোপসনার আয়োজন করা হত। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রটেস্টান্ট প্রেরণকর্মীগণ পুনরায় তাদের আগের জায়গায় ফিরে আসতে সক্ষম হন। এরই সঙ্গে যেজুইটগণও আসেন এবং এতে প্রটেস্টান্ট ও কাথলিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। রাণী দ্বিতীয় রানাভালোনা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রটেস্টান্ট ধর্মমতে দীক্ষিত হন। মাদাগাস্কারে ফরাসীদের অনুপ্রবেশের ফলে তা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি ফরাসী উপনিবেশে পরিণত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত থাকে ও তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ প্রটেস্টান্টদেরকে শেষ পর্যন্ত প্যারিস মিশনারী সোসাইটির ফরাসী প্রটেস্টান্টদের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হয়।

[২৫৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর মালাগাছির সাক্ষ্যমরগণ

মাদাগাস্কারে যেজুইট প্রেরণকর্মীদের মঙ্গলবাণী প্রচার প্রচেষ্টার কথা বর্ণনা করার পর স্থানীয় মিশন প্রধান ফাঃ জুয়েন প্রটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের কথা বলেন, যারা কিনা এই দ্বীপের টেনেরিফ অঞ্চলে নির্যাতন কবলিত হয়েছিলেন। এই চিঠিটির রচনাকাল প্যারিস, ১লা অক্টোবর, ১৮৬০। ফাঃ জুয়েন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ছদ্মবেশে টেনেরিফে ব্যক্তিগতভাবে সফর করেছিলেন।

"পরিশেষে, আমাদের অপর খ্রীষ্টান ভাইদের (প্রটেস্টান্টদের) সম্বন্ধে একটা কথা না বললেই নয়। বৃদ্ধা রাণীর (রানাভালোনা) নির্বোধ ও বর্বর কু-সংস্কারের দ্বারা তারা যেভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তা ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য ঃ আগুন দ্বারা অত্যাচার, গর্তে ফেলে ও ফুটন্ত পানি ঢেলে অত্যাচার, করাত দিয়ে অত্যাচার – এমন কোন কিছু ছিল না যা তাদের অত্যাচার ও নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে রাণী ও তার সরকার উদ্ভাবন করেননি। এত সব অত্যাচার সত্ত্বেও তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ ছিল এবং কোন কিছুই তাদের মনোবল ভাঙতে পারেনি। ফুটন্ত জল ঢেলে যে দুর্ভাগা ব্যক্তিকে নির্যাতনের দণ্ড প্রদান করা হত, তাকে প্রথমে দড়ি দিয়ে বাধা হত। তাকে এমন করে বাধা হত, যার ফলে তার গায়ের মাংস ছিঁড়ে যেত। এরপর তার সামনে খনন-করা একটি গর্তে তাকে ফেলে দেওয়া হত এবং তার উপর বেশ কয়েক কড়াই ফুটন্ত জল ঢেলে তাকে হত্যা করা হত। কিন্তু নির্মমতার একটা পরিমার্জনা ছিল যা একমাত্র জাহান্নাম দ্বারা সুপারিশ করা হত, নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির এই অত্যাচারের প্রস্তুতি তার নিজের পরিবারকে গ্রহণ করতে হত।

কয়েক বছর আগে দু'জন হতভাগিনী মহিলাকে তাদের খ্রীষ্টান আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করতে গিয়ে তাদের দেহকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। এই বীর নারীগণ ছিলেন তাদের উপর পরিচালিত অত্যাচারের চাইতেও অধিক শক্তিশালী। তাই কোন কিছুই তাদের কাছ থেকে কোন কথা বের করতে সক্ষম হয়নি। এই ছোট্ট মেষপালটির দু'জন নেতাকে সম্প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারার সময় তারা খ্রীষ্ট যীশুর গৌরব গান করতে করতে প্রাণত্যাগ করেন।"

বিশ্বাস প্রচার-এর দু'টি মহাসভার সদস্যদের উদ্দেশে প্রৈরিতিক প্রশাসক আর.পি. জুয়েন কর্তৃক প্রদত্ত একটি ভাষণ Résume de quinze années de la mission de Madagascar থেকে গৃহীত।

আফ্রিকী মিশ্র ধর্মমত ও মশীহবাদ

খ্রীষ্টীয় প্রচারকার্য শিগ্গিরই ভিন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটাল। বিভিন্ন কৃষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন প্রায়শঃ খুব দ্রুত গতিতে এগুতে থাকে। চিরাচরিত কাঠামোগুলোর ন্যায় প্রাচীন ধর্মগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু তবুও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। খ্রীষ্টধর্ম স্থানীয় জনসাধারণের কাছে অতি মাত্রায় ইউরোপীয় ঠেকে বলে সময় সময় তাদের মধ্যে হতাশাবোধ সৃষ্টি করে ঃ খ্রীষ্টান হওয়া দেখা গেল, কাউকে শ্বেতকায় মানুষদের সুবিধার অংশীদার করে তোলে না। আর তাই তো কেউ কেউ একটা আফ্রিকী খ্রীষ্টধর্ম সাজানোর প্রচেষ্টা চালান। সম্ভবতঃ এটা ছিল একদিকে ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে একটা রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া, আবার অন্যদিকে রূপান্তরিত খ্রীষ্টীয় ধর্মাচার ও চিত্রকল্পের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাচীন ধর্মসমূহের প্রতিকী ভাবের পুনরাবিষ্কার।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিগত পৃথকীকরণ কৃষ্ণাঙ্গদের একটি ইথিওপীয় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার তাগাদা দেয়, যা বাইবেলে উল্লিখিত ইথিওপিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ইথিওপীয় মণ্ডলী মৃত ব্যক্তিদের পূজা ও মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পীড়িতদের নিরাময় করার প্রথা বজায় রাখে।

উইলিয়াম ওয়েড হ্যারিস নামে একজন লাইবেরীয় এপিসকোপাল খ্রীষ্টান ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবদূত গাব্রিয়েলের এক দিব্য দর্শন পেয়ে দশ আজ্ঞাভিত্তিক একটি ধর্ম প্রচার করেন। এই ধর্ম ভক্তিবস্তুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ও পরিমিত বহুবিবাহ মেনে নেয়।

বেলজীয় কঙ্গোতে শিমন কিম্বাঙ্গু নামে একজন ব্যাপ্টিস্ট কাটেখিষ্ট ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে একটি অলৌকিক দর্শন লাভ করেন। তিনি খ্রীষ্টের পুনরাগমন ও বেলজিয়ামের আধিপত্য থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ঃ এর দরুণ তিনি আজীবন কারাবন্দী ছিলেন। এটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উপদলের শুরু যা ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর সম্প্রসারিত হয়।

॥৩ ॥প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রেরণকার্য/ক্ষেত্র

১। যুদ্ধের ফলাফল

১৯১৪-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধ প্রেরণকার্যের জন্য একটি চপেটাঘাত স্বরূপ ছিল। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় তাদের সক্রিয় কর্মীদের একটা অংশ হারায়। তরুণ প্রেরণকর্মীদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়, আর সেখান থেকে ফিরে আসেননি। প্রেরণকার্যে নিয়োজিত সম্পদরাজিও নিঃশেষিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা, জার্মান উপনিবেশগুলো, যথা – প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, ক্যামেরুন, টোগো ফরাসী বা ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত হলে জার্মান প্রেরণকর্মীদের হয় তাদের বহিষ্কার করা হয় নতুবা গৃহবন্দী ক'রে রাখা হয়। গাবোনে ডঃ আলবার্ট স্বাইজার-এর ঘটনাটি এ ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহাযুদ্ধে জড়িত কাথলিকদের একাত্মতা খণ্ডন নতুন খ্রীষ্টানদের চোখে খ্রীষ্টাদর্শ-প্রচারের ভাবমূর্তিকে ম্লান করে দেয়। মহাযুদ্ধ উপনিবেশিত জাতিগুলোর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ঔপনিবেশিক সেনাদলগুলো খ্রীষ্টীয় সভ্যতা সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করে।

সার্বজনীন পত্র

একের পর এক করে যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটছিল তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট তাঁর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সার্বজনীন পত্রে *(Maximum illud)* প্রবল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। এই পত্রে তিনি মণ্ডলীর আত্মসমালোচনা [২৫৭]

করেন যা শুনতে তখনো পর্যন্ত কেউ অভ্যস্ত হয়নি। পোপ মহোদয় স্বীকার করেন তিনি প্রেরণকর্মীদের জাতীয়তাবাদের ব্যাপারে শঙ্কিত, কেননা উক্ত জাতীয়তাবাদের চেতনা ঈশ্বরের ও তাদের নিজ নিজ দেশের উদ্দেশ্যকে বানচাল করে যেহেতু তারা তাদের কর্মক্ষেত্রকে একটা ব্যক্তিগত মৃগয়াভূমি রূপে বিবেচনা করত। তিনি বলেন, তিনি বুঝতে পারছেন না যেসব প্রেরণ ক্ষেত্রের দেশ কয়েক শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টান হয়েছে, সেখানে কেন দেশীয় যাজকসম্প্রদ্রায় নেই, কেন সত্যিকার কোন প্রকৃত স্থানীয় মণ্ডলীও গড়ে উঠেনি।

২। পোপ একাদশ পিউসের অধীনে রোমে প্রেরণকার্য কেন্দ্রায়ন

পোপ একাদশ পিউস পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্টের কয়েকটি ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেছিলেন। তিনি তাঁর মূল শিক্ষা *Rerum Ecclesiae* (১৯২৬) নামক সার্বজনীন পত্রে বিবৃত করেন। মণ্ডলী ও তার প্রেরণকার্য রাজনীতির ঊর্ধ্বে –এই সত্যটি সর্বসমক্ষে তুলে ধরে পোপ রোমে কেন্দ্রায়ন ক'রে ও কার্ডিনাল ভন রোসামকে প্রধান ও মঙ্সিনিয়র কস্তানতিনিকে সচিব নিয়োগ ক'রে ধর্মপ্রচার সংসদের ভূমিকা জোরদার করেন। বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে মণ্ডলীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাদশ পিউস কূটনৈতিক ভূমিকা বিহীন প্রতিনিধি ও প্রৈরিতিক দর্শনার্থীদের তাদের নিকট প্রেরণ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিয়োন্স থেকে রোমে ধর্মবিশ্বাস – প্রচার সংসদের সদর দপ্তর

স্থানীয় যাজক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

[২৫৭] ৩০শে নভেম্বর, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ১৫শ বেনেডিক্টের প্রৈরিতিক পত্র Maximum illud

১৯১৪-১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধ প্রেরণকার্য ব্যাহত করে। দেশীয় যাজকসম্প্রদায় ছিল না সে সকল প্রেরণকার্যক্ষেত্রগুলোতে যেগুলো ইউরোপীয় প্রেরণকর্মীদের ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। উপরন্তু, প্রেরণকর্মীগণ সময় সময় মঙ্গলসমাচারের মর্মবাণীর পরিপন্থী অতিরঞ্জিত জাতীয়তাবাদ প্রদর্শন করেছিলেন।

"একটি বিষয় আছে, যার প্রতি প্রেরণকার্যে নিয়োজিত নেতৃবৃন্দের বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। সেটি হল – দেশীয়/স্থানীয় যাজকদের সংগ্রহ ও গঠন-প্রশিক্ষণ দান করা। পোপগণ কর্তৃক বিষয়টির উপর এত গুরুত্ব প্রদান শোচনীয় এই পরিস্থিতিকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে কাথলিক ধর্মবিশ্বাস প্রবর্তিত হয়েছে কয়েক শতাব্দী আগে এবং যেখানে এক নিম্নমানের স্থানীয় যাজকসম্প্রদ্রায় রয়েছে মাত্র। তা ছাড়াও একাধিক জাতি রয়েছে যারা যদিও বা সেই প্রারম্ভিক পর্যায়ে সুসমাচারের আলোকে আলোকিত হয়েছে, বর্বরতা বা অসভ্যতা থেকে সভ্যতায় নিজেকে উন্নীত করতে সক্ষম ও এর মধ্যে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে বিশিষ্ট লোকদের খুঁজে পেতে পারে, তবুও কয়েক শতাব্দী ধরে মঙ্গলসমাচার ও মণ্ডলীর হিতকর কার্যসাধন সত্ত্বেও মণ্ডলী পরিচালনার জন্য ধর্মপাল ও ধর্মযাজক তৈরী করতে সফল হয়নি যারা পদমর্যাদার দিক দিয়ে তাদের সহ-নাগরিকদের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, এ যাবৎ প্রেরণকার্যক্ষেত্রের যাজকদের শিক্ষাদানে কিছুটা ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি ছিল। ...

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কিছু পত্রিকা বের হয়েছে। এদের সম্পাদকমণ্ডলী তাদের নিজ দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখতে গিয়ে ঐশরাজ্যের স্বার্থের ব্যাপারে কম আগ্রহ প্রদর্শন করছেন দেখে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত। আমাদের যা অবাক করে তা হচ্ছে এই ঃ এ ধরনের মনোবৃত্তি যে অ-খ্রীষ্টানদের অন্তরকে ধর্মের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে তা নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা নেই। যেহেতু একজন কাথলিক প্রেরণকর্মী তার দেশের নয় বরং স্বয়ং খ্রীষ্টের প্রেরণকর্মী, তাই তাকে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যাতে যে লোকের সঙ্গেই তার দেখা হোক না কেন, সে যেন প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারে তিনি এমন এক ধর্মের সেবক যা কোন জাতির মধ্যেই বিজাতীয় নয়, কারণ এই ধর্ম যে সমস্ত মানুষকে আপন করে নেয়, তারা 'আত্মায় ও সত্যে ঈশ্বরের পূজা করে' এবং এর মধ্যে 'ইহুদী বা অনিহুদী, পরিচ্ছেদিত বা অপরিচ্ছেদিত, বর্বর অসভ্য মানুষ, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ ব'লে এখন কোন কিছুই নেই। খ্রীষ্টই সব – সবারই মধ্যে' (কলসীয় ৩:১১)।"

স্থানান্তরিত করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্যবর্ষ উপলক্ষ্যে রোমে একটি বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে প্রেরণকার্যসমূহের বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরণ রবিবার প্রবর্তিত হয় (অক্টোবর মাসের তৃতীয় রবিবার)। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শিশু যীশুর সাধ্বী তেরেজা প্রেরণকার্যের দ্বিতীয় প্রতিপালিকা হন। প্রেরণকার্যক্ষেত্রের সংবাদ পরিবেশনের লক্ষ্যে Fides এজেন্সী স্থাপিত হয়।

৩। স্থানীয় মণ্ডলী গঠনের লক্ষ্যে

পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্টের ইচ্ছানুসারে, পোপ একাদশ পিউস প্রেরণকার্যাধীন অঞ্চলগুলোতে যাজকদের একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক-জাল স্থাপনের বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন যাতে ইউরোপীয় প্রেরণকর্মীগণ যখন তাদের কর্মক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হবেন, তখন যেন স্থানীয় মণ্ডলীগুলো স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারে। তিনি এতে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন দূর প্রাচ্যের সঙ্গে সুপরিচিত মন্সিনিয়র কন্তানতিনি ও ফাদার লেব্বের দ্বারা। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পোপ একাদশ পিউস একজন ভারতীয় যেজুইটকে ধর্মপাল নিযুক্ত করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে পোপ স্বয়ং রোমে একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রথম ছয় জন চীনাকে ধর্মপাল পদে অভিষিক্ত করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগাসাকিতে প্রথম জাপানী ধর্মপাল, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভিয়েতনামী ধর্মপাল ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মপাল নিয়োগ হতে

[২৫৮] চীনে খ্রীষ্টধর্ম ও স্বদেশপ্রেম

কোন কোন ইউরোপীয় প্রেরণকর্মীর ফরাসী 'দেশপ্রেম' দ্বারা ও ফরাসী কনসুল দ্বারা চীনের প্রেরণকার্যাধীন অঞ্চলগুলোর নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মর্মাহত হয়ে ফাঃ লেব্বে তাঁর ধর্মপালের সঙ্গে প্রতিবাদে তর্ক-বির্তক করেন। এটা তাঁর জন্য সুনামহানি ব'য়ে আনে এবং সাময়িকভাবে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য করে। তবে পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্টের Maximum Illud নামক পত্রটি (১৯১৯) এবং পোপ একাদশ পিউস কর্তৃক ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চীনা ধর্মপালদের অভিষেক প্রমাণ করবে ফাঃ লেব্বের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সুযুক্তি নির্ভর।

মন্সিনিয়র রেনোদ, নিংপোর নিকট পত্র, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

"ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রীষ্টানদের মত একইভাবে চীনা খ্রীষ্টানদেরও দেশপ্রেমিক হওয়ার একটি অধিকার, আরও বেশী একটি দায়িত্ব রয়েছে। প্রৈরিতিক কার্যে এই সতেরো বছরের অভিজ্ঞতা আমাকে একটি অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে যে, এ সমস্ত মানুষের কাছে ঐশরাজ্যের আগমনের মূল প্রতিবন্ধকতাটি হচ্ছে জাতীয়বাদের সমস্যা – তবে আমি বলছি না এটাই একমাত্র প্রতিবন্ধকতা। মানবীয় ভাবে বলতে গেলে, কোন অলৌকিক কাজ ছাড়া, মণ্ডলী থেকে এই যে বাধা তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে তা অনতিক্রম্য, আর আমরা তা শুধু ছিন্নই করতে পারি। এ কারণেই ইউরোপীয় মণ্ডলীগুলোতে যদি দেশপ্রেম প্রশংসনীয় ও প্রশংসিত হয়, তবে তা চীনের মণ্ডলীর জন্য অত্যাবশ্যক। স্বদেশপ্রেম হচ্ছে একটি অন্যতম বা অপরিহার্য মানবীয় শর্ত, কাথলিক ধর্ম যেন জনগণের মধ্যে শিকড় লাগাতে পারে, তাদেরকে আকর্ষণ ক'রে বুকে তুলে নিতে পারে।

মন্সিনিয়র, নতজানু হয়ে মাটিতে আমার কপাল ঠেকিয়ে আমি আপনাকে বলছি একজন ধর্মপালরূপে তেত্রিশ বছর ধরে আপনি ভাল যাজকদের গঠন-প্রশিক্ষণ দিয়েছেন; আমাকে বলা হয়েছে তাদের কেউ কেউ নাকি সু-শিক্ষিত হয়েছেন এবং অন্যান্যরা বাস্তবিকই নাকি বিশিষ্টতার অধিকারী হয়েছেন। আপনার কি কখনও মনে হয়নি যে, তাদের মধ্যে সেরা ফাদার সোন মন্সিনিয়র ফানরু বা ফাঃ লেপার্স-এর সমকক্ষ বা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট ব'লে প্রতিপন্ন হতে পারতেন ? ফাঃ জি একজন জেলার পরিচালক হতে পারতেন ? আপনার যদি এই মর্মে ভয় হয় যে, আপনার ইউরোপীয় সহকর্মীগণ এটা মেনে নিতে পারবে না, অন্য জাতির মানুষের অধীন হতে চাইবে না, তাহলে কি আপনি তাদের ভুল বিচার করছেন না ? আমরা যাজকগণ কি খ্রীষ্ট যীশুর প্রতি ভালবাসায় তা করার যোগ্য নই যা অর্থলিপ্সায় এত বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় বেসামরিক লোকেরা করছে রেলপথে, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক আদায়ে, স্কুলে ? এ ব্যাপারে, আমাদের দেশীয় যাজকদের গঠন প্রশিক্ষণ সহকারী যাজকদের প্রস্তুতিকল্পে চিরদিনই ক্লান্তিকরভাবে খুড়িয়ে খুড়িয়ে এগিয়ে চলছে ...। "

দেখা গেল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৪৮টি প্রেরণকার্যাধীন অঞ্চলকে দেশীয় ধর্মপালদের হাতে ন্যস্ত করা হয়ে থাকে।

একইসঙ্গে পোপ দেশীয় যাজকদের গঠন-প্রশিক্ষণের উপর জোর দেন। তিনি পৃথিবীর অন্য সকল যাজকদেরকে দেয়া অনুরূপ পূর্ণাঙ্গ গঠন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন। ভাটিকানের পুণ্য আসনের নিকট সরাসরি দায়ী আঞ্চলিক সেমিনারী স্থাপন করা হয়। রোমে বিশ্বাস-বিস্তার কলেজকে একটি নতুন মাত্রা প্রদান করা হয়। প্রেরণকার্যক্ষেত্রগুলোর মাত্রাতিরিক্ত জাতীয়তাবাদী রূপ থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে রোমীয়করণের উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু তাতে সব সমস্যার সমাধান হয়নি।

খাপ খাওয়ানো

দু'টি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টাতে দেশীয় কৃষ্টির সঙ্গে বিশেষ ক'রে শিল্পকলার ক্ষেত্রে কাথলিকদের খাপ খাওয়ানো সম্পর্কে খুব আলাপ হত। এটা ছিল প্রেরণ কর্মকাণ্ডে খ্রীষ্টীয় শিল্পকলা বিষয়ক মন্সিনিয়র কস্তানতিনির নির্দেশের (১৯৩৭) মূল লক্ষ্য। তবে এসব বেশী দূর অগ্রসর হয় না। দূরপ্রাচ্যে গীর্জাগুলোর ছাদ একটু উঁচু করা হয়। 'খাপ খাওয়ানো' কথাটি কিছুটা অতি খুঁতখুঁতে। সব কিছুর সূচনাবিন্দু ইউরোপই থেকে যায়। তবে অনেকেই বুঝতে পারত যে, শুরু থেকেই খ্রীষ্টধর্মের উচিত প্রত্যেক জাতির স্বভাবগত বিশেষত্ব ব্যক্ত করা। যদিও এরাই একমাত্র ব্যক্তি ছিল না, দু'জন যাজক এই লক্ষ্যে কিছুটা অগ্রসর হতে চেষ্টা করেন।

[২৫৮] এ প্রসঙ্গে ফাদার ভিনসেন্ট লেব্বের (১৮৭৭-১৯৪০) কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তিনি চীনা ব্যক্তিত্বকে

[২৫৯] খ্রীষ্টমণ্ডলী এক ও বহুরূপী

"ভারতবর্ষে আমার বারো বছরকাল অবস্থান, হিন্দু বন্ধু-বান্ধবদের সংস্পর্শ বিশ্বজনীন ও অনন্য খ্রীষ্ট কর্তৃক সর্বাঙ্গীন পরিত্রাণের এই অন্তর্দৃষ্টিই আমার মধ্যে আরও জোরদার ক'রে তুলেছে।

এমন অনেক খ্রীষ্টান রয়েছে যারা খ্রীষ্টধর্মের নিয়তিকে জগতের নিয়তির সঙ্গে কম-বেশী অভিন্ন ব'লে গণ্য ক'রে থাকে, যেমনটা প্রকাশ পেয়েছে মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রথম দশ বা পনের শতাব্দী পর্যন্ত, আর যখন খ্রীষ্টধর্মে নতুন নতুন জাতি প্রবেশ করে তখন মণ্ডলীর সংখ্যাগত বৃদ্ধি ও স্থানের দিক দিয়ে ব্যাপকতর প্রসারণ ছাড়া আর কিছু দেখে না। সাধু টমাসের পর আর কি শিখার আছে, ট্রেন্ট মহাসভার পর, মণ্ডলীর আর কোন প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করার আছে? ইহা ইতিমধ্যে সাবালকত্ব লাভ করেছে। যে কেউ এর মধ্যে প্রবেশ করে, সে এক মন্দির ভেদ করে, যার মধ্যে কোন পাথর আর বাকী নেই।

ঐশ প্রত্যাদেশের পর্যায়ে খ্রীষ্টমণ্ডলী আরম্ভ থেকে সব কিছুই লাভ করেছে, কিন্তু যার দ্বারা সে মানবীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সেই উন্নয়নের পর্যায়ে – কিংবা মানবীয় ক্ষেত্র পরিগ্রহ করে ও রূপান্তরিত হয় – কোন শতাব্দীই কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ইঙ্গিত বা চিহ্নিত করে না। .... সাধু আগস্তিনের সময় যেমনটা বলা হয়েছিল, মণ্ডলী শুধু বলবে না, 'ল্যাটিন আমার ভাষা, গ্রীকও আমার, সিরীয়ও আমার ভাষা'; মণ্ডলী এগুলোর সঙ্গে আরও যোগ করবে সংস্কৃত, তামিল ও চীনা ভাষা এবং এসব ভাষা যে সকল ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতি প্রকাশ করে। এসব ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতি তো এখনো পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরীয়, জার্মান ও স্লাভনিক জগতে প্রবেশ করেনি।

নিঃসন্দেহে নতুন নতুন ধরনের আধ্যাত্মিকতা, সাধনমার্গ রূপনীতি, নিগূঢ়তত্ত্বের অভিব্যক্তি, পূজার্চনা ও ব্রতজীবন ধারণ তাদের বিকাশের জন্য এক ও বহুরূপী একটি মণ্ডলীর বুকে ভারত চীনের ন্যায় সভ্যতার আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে এবং সম্ভবতঃ যুগের পর যুগ অপেক্ষায় থাকবে।

"খ্রীষ্টধর্ম অতীতে যা, বর্তমানেও যা সব সময় থাকবে 'আসন্ন যা' চিরন্তন আত্মা সৃষ্টির মধ্যে বিরাজ ক'রে সব সময় থাকবেন 'পূর্ণতাদানকারীস্বরূপ'।"

জে. মনকানিন, Théologie et Spiritualisté Missionaires, 1985 (অনুচ্ছেদটি লেখা হয়েছিল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে)

শ্রদ্ধা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম চীনা কাথলিক দৈনিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর অভিমত চীনে অবস্থিত ফরাসী প্রেরণকার্যের কর্মকর্তাগণের মধ্যে কয়েকজনকে তাঁর শত্রুতে পরিণত করে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্সিলিয়ারী মিশনারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোসাইটি এমন যাজকদের নিয়ে গঠিত হয় যারা দেশীয় ধর্মপালদের অধীনে পালকীয় কাজে আত্মনিয়োগ করেন। চীনে তিনি ব্রাদার ও সিস্টারদের চীনা সংঘ স্থাপন করেন। তিনি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনা নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন ও সিনো-জাপানী যুদ্ধের সময় আহতদের জন্য সাহায্য-সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম সংগঠিত করেন। ভিনসেন্ট লেব্বের মনে সব সময়ই এই চিন্তাটা ঘুরপাক খেত যে, মণ্ডলীকে যেন মাত্র পাশ্চাত্যের পক্ষে চীন দেশে একটি প্রবেশ-পথ মনে করা না হয়। 'সংস্কৃত্যায়ন' শব্দটির উদ্ভবের আগে থেকেই তিনি চীনে খ্রীষ্টধর্মের একটা সত্যিকার সংস্কৃত্যায়নের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন।

লিয়োন্সের একজন যাজক জুল্‌স্ মনশানিন (১৮৯৫-১৯৩৭) অত্যন্ত দ্রুত এক বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুহল প্রদর্শন [২৫৯]
করেন। খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে সংলাপে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে তিনি অক্সিলিয়ারী মিশনারী সোসাইটির একজন সভ্যরূপে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। তিনি বেনেডিক্টীয় হেনরী লে সো-এর সঙ্গে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এঁদের দু'জনেই ধ্যান-জীবন যাপন করতেন যা ভারতের নির্জন বাস-এর সঙ্গে খ্রীষ্টীয় আশ্রম ঐতিহ্যের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করে।